তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' যার ভিশন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' এ প্রথম ঘোষণা করা হয় যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৬ সালে 'উন্নয়নে আইসিটি পুরস্কার' অর্জন করেন ।
- বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই রাউটার (Wifi Router) স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আইটি সেক্টরে বহুমানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সঙ্গে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. সুরাইয়া পারভীন

মোস্তাফা জব্বার

মুনির হাসান

লুৎফুর রহমান

মোঃ মুনাব্বির হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবন সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, এ পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্বাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে এ বিষয় আরও আগ্রহী করে তুলবে, যা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-সার্ভিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-কমার্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সামাজিক যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিনোদনের ক্ষেত্রে আইসিটির ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি পোস্টার ডিজাইন করতে পারব।

একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিগত শতাব্দীতে সম্পদের যে ধারণা ছিল, একুশ শতকে এসে সেটি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছে যে, একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্যও নয়– এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর সম্পদের এই নতুন ধারণাটি সারা পৃথিবীতেই মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎটি পাল্টে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এখন একুশ শতকের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি একুশ শতকের পৃথিবীটা আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির ওপর দাঁড়াতে শুরু করছে। একুশ শতকে এসে আমরা আরো দুটি বিষয় শুরু করেছি– যার একটি হচ্ছে Globalization, অন্যটি হচ্ছে Internationalization। এই দুটি বিষয় ত্বরান্বিত হওয়ার পেছনের কারণটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যেকোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা বিশ্বায়নের কারণে নিজের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটি বোঝার জন্যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের উদাহরণটিই নিতে পারি। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে– তাঁরা যে যেখানে আছে সেই অংশটুকুই বাংলাদেশ। এক অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে! আবার বাংলাদেশের অধিবাসী হয়েও তারা পৃথিবীর অন্য দেশের নাগরিক হয়ে বেঁচে আছে, আন্তর্জাতিকতা এখন এই নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম।

আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষকে এক সময় বেঁচে থাকার জন্যে পুরোপুরি প্রকৃতির অনুকম্পার ওপর নির্ভর করতে হতো। মানুষ বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পৃথিবীর যে সকল জাতি শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, এক সময় তারাই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একুশ শতকে যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে, তখন আবার সেই একই ব্যাপার ঘটছে। যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নেবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে।

এই নতুন বিপ্লবে অংশ নিতে হলে বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে সেটি আমরা অনুভব করতে পারি। যদি আমরা বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো দেখতে চাই তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking), সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা।

আইসিপিসি প্রতিযোগিতা

সত্যি কথা বলতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা (Skill) হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকলেই একজন এটি ব্যবহার করে তার বিশাল বৈচিত্র্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত সে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন, মূল্যায়ন করে নতুন তথ্য সৃষ্টি করতে পারবে না। এই দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নিতে পারবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আজকের বিকাশের পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। তার এবং তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটারের গণনা ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের বিকাশ বর্তমানে আইসিটিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে।

চার্লস ব্যাবেজ

আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ বা প্রচলন শুরু হয় চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) [১৭৯১-১৮৭১] নামে একজন ইংরেজ প্রকৌশলী ও গণিতবিদের হাতে। অনেকে তাঁকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলে থাকেন। তিনি তৈরি করেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন। ১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে একটি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়। দেখা যায় যে, সেটি সঠিকভাবেই কাজ করছে এবং পরবর্তীতে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি গণনা যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন।
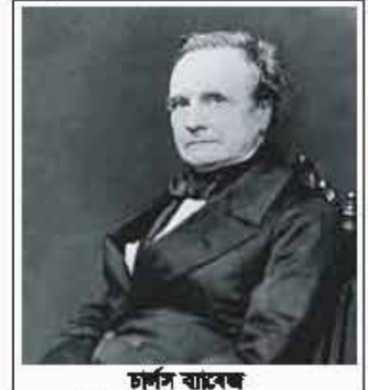
অ্যাডা লাভলেস

তবে গণনার কাজটি কীভাবে আরো কার্যকর করা যায় সেটি নিয়ে ভেবেছিলেন কবি লর্ড বায়রনের কন্যা অ্যাডা লাভলেস (Ada Lovelace) (১৮১৫-১৮৫২)। মায়ের কারণে অ্যাডা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে তার পরিচয় হলে তিনি চার্লস ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগ্রামিং'-এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে অ্যাডা লাভলেসকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪০ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তব্য দেন। সে সময় অ্যাডা লাভলেস চার্লস ব্যাবেজের সহায়তা নিয়ে বক্তব্যের সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজের ধারাটি ধাপ অনুসারে ক্রমান্বিত করেন। তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবারো প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা লাভলেস অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) (১৮৩১-১৮৭৯) তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা প্রকাশ করেন। তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

জগদীশ চন্দ্র বসু

বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণে প্রথম সফল হন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (Jagadish Chandra Bose) (১৮৫৮–১৯৩৭)। ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার প্রকাশিত না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে একই কাজ প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পান ইতালির বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marconi) (১৮৭৪-১৯৩৭)।

গুগলিয়েলমো মার্কনি

এ জন্য তাকে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশ শতকে ইলেকট্রনিক্সের বিকাশের পর প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের আইবিএম কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার তৈরির পথ সুগম হয়।

রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল (Internet Protocol) ব্যবহার করে আরপানেট (Arpanet) আবিষ্কৃত হয়। বলা যায়, তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। আর এ বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (Ramond Samuel Tomlinson)। তিনিই প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন।
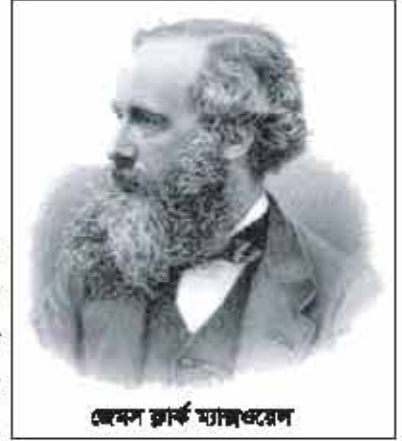
স্টিভ জবস

মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাবের পর বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রে সেটি ব্যবহার করে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির কাজ শুরু হয়। স্টিভ জবস (Steve Jobs) (১৯৫৫-২০১১) ও তার দুই বন্ধু স্টিভ ওজনিয়াক (Steve Wozaniak) ও রোনাল্ড ওয়েইন (Ronald Wayne) ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অ্যাপলের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানান পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

অন্যদিকে ১৯৮১ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের বানানো পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য William Henry Gates অথবা Bill Gates (জন্ম অক্টোবর ২৮, ১৯৫৫) ও তাঁর বন্ধুদের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটকে দায়িত্ব দেয়। বিকশিত হয় এমএস ডস এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার দিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হয়।

১৯৮৯ সালে স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি (Sir Timothy John Berners-Lee) (জন্ম জুন-৮, ১৯৫৫) নামে একজন ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (http) ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (*www*) জনক হিসেবে পরিচিত। নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিশ্বের নানান দেশের মধ্যে ইন্টারনেট বিস্তৃত হয়। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি

মার্ক জাকারবার্গ

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মার্ক জাকারবার্গ (Mark Zuckerberg) (জন্ম মে ১৪, ১৯৮৪) ও তাঁর চার বন্ধুর হাতে সূচিত হয় ফেসবুকের। শুরুতে এটি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনেকেই ফেসবুক ব্যবহার করেন। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ব্যবহার করেন।

ই–লার্নিং ও বাংলাদেশ

পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকে মোটামুটি একইভাবে কাজ করে আসছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার পর প্রথমবার সেই পদ্ধতির এক ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং ই-লার্নিং নামে নতুন কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি। ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্যে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং কিন্তু মোটেও সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের একটা বিষয় পড়ানোর সময় অনেক কিছুই হয়তো হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। যেমন- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্য নিয়ে আরও সুন্দরভাবে বিষয়টির দৃশ্যমান উপস্থাপন করতে পারেন। সেটি এমনকি Interactive-ও হতে পারে।

আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্যে অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষকই এটি ব্যবহার করছেন।

সারা পৃথিবীতেই ই–লার্নিংয়ের জন্যে নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়েই একজন সেই কোর্সটি নেয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট পর্যন্ত অর্জন করতে পারছে।

আমাদের বাংলাদেশও এতে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা এ ধরণের বেশ কিছু ওয়েব পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারলেও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নানাভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা পাশাপাশি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, একে অন্যের সহযোগী হয়ে শিখতে পারে। ই-লার্নিংয়ের বেলায়

এই বিষয়গুলো প্রায় সময়ই অনুপস্থিত থাকে, পুরো প্রক্রিয়ায় মানবিক অংশটুকু না থাকায় পদ্ধতিটা যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। সে কারণে ই–লার্নিংকে সফল করতে হলে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হয়।

আমাদের বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের অনেক বড় সুযোগ আছে, কারণ অনেক বড় বড় সীমাবদ্ধতা আসলে ই-লার্নিং ব্যবহার করে সমাধান করে ফেলা সম্ভব। তবে প্রচলিত ই-লার্নিংয়ের জন্যে ইন্টারনেটের স্পিড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ই-লার্নিংয়ের শিখনসামগ্রী (Materials) তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার গুরুত্বের সাথে এ ধরণের শিখনসামগ্রী তৈরি করছে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

> **দলগত কাজ**
>
> শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ই-লার্নিং কী ভূমিকা রাখতে পারে দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

গুড গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স।

একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই-দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরেও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্বে যশোর জেলায় একজন শিক্ষার্থী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য নিজে অথবা প্রতিনিধিকে সিলেট গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ায় জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ লাগতো, সেটি এখন মাত্র ২-৫ দিনে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। কেবল বিদ্যুৎ নয়, পানি ও গ্যাসের বিলও এখন অনলাইনে ও মোবাইল ফোনে পরিশোধ করা যায়। গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে

কোনো কোনো কার্যক্রম ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টা করা সম্ভব যেমন- ATM সেবা, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা ইত্যাদি। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে ই-গভর্ন্যান্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতাও বেড়েছে। ফলে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে। এখনো কিছু ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হওয়া বাকি রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হলে সুশাসনের পথে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ

BANGLADESH RAILWAY

This Ticket will be valid on production of Photo Identity Card of the Passenger.

সরকারি এবং বেসরকারি অনেক সেবামূলক সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে অথবা সময়ে সময়ে দেশের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা হতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত কিংবা কোনো জমির দলিলের নকল সরবরাহ করা। ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে এই সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে অবশ্যই সেবাদাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হতো। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতা নিজ বাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে বা ইন্টারনেটে একই সেবা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য কোনো আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট সংগ্রহের কথা বিবেচনা করা যায়। কিছুদিন পূর্বেও এই টিকেট সংগ্রহের জন্য যাত্রী নিজে অথবা তার কোনো লোকের ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকেট সংগ্রহ করতে হতো। এই পদ্ধতি এখনও বহাল আছে। তবে, এর পাশাপাশি এখন যে কেউ অনলাইনে টিকেট সংগ্রহ করতে পারে। অনলাইনেই টিকেটের মূল্য পরিশোধ করা যায়। এভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যাপারটি ই-সার্ভিস বা ই-সেবা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ই-সেবার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–এটি স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই অনেক ই-সেবা চালু হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল সংস্করণ, ই–পুর্জি, ই-পর্চা, ই-টিকেট, টেলিমেডিসিন, অনলাইন আয়কর হিসাব করার ক্যালকুলেটর ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. **ই-পুর্জি :** দেশের প্রথম দিককার ই-সেবাসমূহের একটি। দেশের ১৫টি চিনিকলের সকল আখচাষি এখন এসএমএসের মাধ্যমে পুর্জি তথ্য পাচ্ছে। পুর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আওতাধীন আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। এসএমএসের মাধ্যমে আখচাষিরা তাৎক্ষণিকভাবে পুর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।

খ. **ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ই-এমটিএস) :** বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়।

গ. **ই-পর্চা সেবা :** বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পর্চা। পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ বড় বড় রেকর্ড বই থেকে তথ্যসমূহ পূর্ব নির্ধারিত ছকে পূরণ করে আবেদনকারীকে সরবরাহ করতেন। এজন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

ঘ. **ই-স্বাস্থ্যসেবা :** বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

ঙ. **রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং :** বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট এখন মোবাইল ফোনেও ক্রয় করা যায়। আবার অনলাইনেও টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, নিজের সুবিধামতো সময়ে রেলস্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকেট সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোন বা অনলাইনে টিকেট সংগ্রহ করা হলে ট্রেন ছাড়ার অল্প সময় পূর্বে যাত্রীকে স্টেশনে যেতে হয় এবং মোবাইল ফোন বা অনলাইনে প্রাপ্ত গোপন নম্বর প্রদর্শন করে সেখানে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে যাত্রার টিকেট সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা। দ্বিতীয়ত ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার 'দোকান'টি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। তৃতীয়ত মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরো একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে ই–কমার্সের প্রসার হচ্ছে। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, শৌখিনসামগ্রী ইত্যাদি ই-কমার্সের মাধ্যমে বেচাকেনা হচ্ছে। প্রচলিত বাণিজ্যের মতো ই-কমার্সেও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এক ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে। তোমরা ইতোমধ্যে ওয়েবসাইট, টিভি বা পত্র-পত্রিকায় এধরনের অনেক ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলেছ।

বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন কর্মক্ষেত্রে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমত প্রচলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির প্রয়োগের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যদিকে আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

প্রচলিত কর্মক্ষেত্র এবং পুরাতন ব্যবসা-বাণিজ্যে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের সাধারণ দক্ষতা একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানি, সরকারি দপ্তরে কাজ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর থেকে উপস্থাপনা সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং থেকে ই-মেইল, নানান ধরনের বিশ্লেষণী সফটওয়্যার ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষায়িত সফটওয়্যার (যেমন: ব্যাংকিং সফটওয়্যার) ব্যবহারেও পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়।

অন্যদিকে আইসিটি নিজেই একটি বড় আকারের কর্মবাজার সৃষ্টি করেছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি এখন নতুন দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। কেবল দেশে নয়, আইসিটিতে দক্ষ কর্মীরা দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এই কাজের একটি বড় অংশ দেশে বসেই সম্পন্ন করা যায়। আউটসোর্সিং করে এখন অনেকেই বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন আইসিটিতে সামাজিক যোগাযোগ বলতে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে এই যোগাযোগ হয়ে পড়েছে সহজ, সাশ্রয়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-মেইল, মোবাইল ফোন ও মেসেজিং সিস্টেম, ব্লগিং এবং সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মসমূহ ব্যবহার করে বর্তমানে আইসিটিভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ অনেকাংশে সহজ।

ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে অনেক প্ল্যাটফর্ম, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। যেমন: ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন ও ইনস্টাগ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো–ফেসবুক ও টুইটার।

- **ফেসবুক (www.facebook.com) :** ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারে। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রুপ। www.stastica.com এর রিপোর্ট (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৮) অনুযায়ী বিশ্বে facebook ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২.৭ বিলিয়ন।
- **টুইটার (www.twitter.com) :** টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ Character-এর মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট (tweet)। টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য সে সদস্যকে অনুসরণ বা follow করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় follower বা অনুসারী।

বিনোদন ও আইসিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত, বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

দেখা যাক বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটেছে। একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে হলে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে হলে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এধরনের বিনোদনের জন্যে মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। একসময় কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। প্রথম যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন তার মূল কাজ ছিল কমপিউট বা হিসাব করা, শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা কম্পিউটারের মালিক হতে পারত। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে এসেছে এবং একসময় মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটার যখন শক্তিশালী হয়েছে তখন এটি শুধু লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশের জন্যে ব্যবহৃত না হয়ে ধীরে ধীরে বিনোদনের জন্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখন সাধারণ মানুষ কম্পিউটারকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে বিনোদনের জন্যে। গান, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র সবকিছুই এখন কম্পিউটার দিয়ে করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সঙ্গীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের

হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্যে কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্যে অডিও সিডি বা ডিভিডির উপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে শোনা ও দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হবার পর নতুন কিছু বিনোদনের জন্ম হয়েছে যেটি আগে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না, তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার গেম। সারা পৃথিবীতেই এখন কম্পিউটার গেমের বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের কম্পিউটার গেমের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটার গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি এটি বিনোদনের অত্যন্ত সফল একটি মাধ্যম। এর সাফল্যের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে এটি ছোট শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ সবাইকেই তার নিজের রুচি মাফিক আনন্দ দিতে পারে। একজন আরেক জনের সাথে কম্পিউটার গেম খেলতে পারে, কম্পিউটারের সাথে খেলতে পারে এমনকি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাইরের কারো সাথেও খেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনোদন উপভোগের তীব্রতা এত বেশি হতে পারে যে, সেটি এক ধরনের আসক্তির জন্ম দিতে পারে এবং সে কারণে কম্পিউটার গেম উপভোগ করার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতেই সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিনোদন সৃষ্টির ব্যাপারেও এক ধরনের বড় ভূমিকা রেখেছে। অ্যানিমেশন বা কার্টুন তৈরি করা এক সময় অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতার কারণে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াই গ্রাফিক্স নির্ভর চলচ্চিত্রের ডিজিটাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্ম হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে কাল্পনিক প্রাণী ডাইনোসর কিংবা ভিন্ন জগতের প্রাণী তৈরি করার জন্যে শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা এখন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

এক কথায় আমরা বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তির কারণে শুধু যে নতুন নতুন বিনোদনের জন্ম নিচ্ছে তা নয়, সেই বিনোদনগুলো এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এটি মাত্র শুরু, ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর বিনোদন কোন পর্যায়ে যাবে সেটি কল্পনা করাও অসম্ভব!

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, ২০২১ সালে তার অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হবে এবং সে কারণে এই সময়ের ভেতরে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি বিশেষ জায়গায় নেওয়ার একটি স্বপ্ন আমাদের সবাইকে স্পর্শ করেছিল। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি শুধু একটি কথা হয়ে থাকেনি। এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে এই দেশের সরকার এবং সাধারণ মানুষ সবাই একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছে।

ক. এনালগ

23:59:59

খ. ডিজিটাল

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার এনালগ ও ডিজিটাল কথাটি দিয়ে আমরা কী বোঝাই। পরিবর্তনশীল (বিচ্ছিন্ন) ডাটাকে যখন সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে এনালগ সংকেত বলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন তাপমাত্রার কথা ধরা যাক, দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা অনুভূত হয়। এই অনুভূত তাপমাত্রাকে যখন সংকেতরূপে প্রকাশ করি তখন তাকে এনালগ সংকেত বলি। এনালগ সংকেতের সাহায্যে আমরা নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম তথ্য পাই না, প্রাপ্ত মানের তারতম্য থাকে। এই এনালগ সংকেতকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দুইটি অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, এই অবস্থাগুলোকে অঙ্কের (Digit) মাধ্যমে প্রকাশ করার ফলে এনালগ সংকেতের তুলনায় আরও নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তথ্য পাওয়া যায়। Digit এর মাধ্যমে সংকেত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত এই ধরনের সংকেতকে ডিজিটাল সংকেত বলা হয়। যেমন: ধর, কাঁটাযুক্ত ঘড়ি এনালগ সংকেত প্রদর্শন করে, পক্ষান্তরে কাঁটাবিহীন ঘড়ি ডিজিটাল সংকেত প্রদর্শন করে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি শুধু একটি 'কম্পিউটার প্রস্তুত দেশ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। এটি আরও অনেক ব্যাপক। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আসলে তথ্য ও যোগাযাগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা আধুনিক বাংলাদেশ বোঝানো হয়। সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য মোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে আমাদের পুরাতন মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক বাস্তবতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তা করা খুব জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশের পেছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর জন্যে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সকল শ্রেণির সব ধরনের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে সরকার চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে; সেগুলো হচ্ছে– মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের সম্পৃক্ততা, সিভিল সার্ভিস এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কাজটি শুরু করেছে দেরিতে। তাই অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অতীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলেও বর্তমানে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশে এখন দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তি প্রসারের একটি সুন্দর দিক রয়েছে, কোনো দেশ বা জাতির একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে সব সময়েই তাদের পিছিয়ে থাকতে হয় না। বড় বড় লাফ দিয়ে (Leap Frog) অন্যদের ধরে ফেলা যায়। তাই বাংলাদেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে অন্য দেশের সমান হবার চেষ্টা করছে।

সরকারের আগ্রহের কারণে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সারা দেশে ফাইবার অপটিক লাইন বসিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাত্র এক-দেড় দশক আগেও এদেশে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় এই দেশের প্রত্যেকটি

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতের নাগালে ফোন রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় পোস্ট অফিসগুলোকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করে মোবাইল মানি অর্ডারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টারের সাথে সাথে ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সেল এবং ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেল দেশের অবকাঠামোতে একটা বড় সংযোজন। মোবাইল টেলিফোন দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানা কিংবা ট্রেনের টিকেট কেনার মতো কাজগুলো নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পাঠ সংযোজন করা হয়েছে– এই বইটি তার প্রমাণ। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরা কোম্পানি গড়ে তুলছে এবং বিশাল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ব্যক্তিগত পর্যায়ে আউটসোর্সিং করে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করছে।

২০১৮ সালের ১২ই মে তারিখটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিনে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম রাষ্ট্র হিসেবে তার নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে প্রেরণ করে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়ার পূর্বভাস নানা ক্ষেত্রে সুফল পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করবে। টেলিভিশন সেবা ও জাতীয় নিরাপত্তার কাজেও এ স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও সম্ভব হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই সাফল্য শুনে কেউ যেন মনে না করে আমরা ইতোমধ্যে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি– এটি মোটেও সত্যি নয়। এই পথে আমাদের আরো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে থাকে তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই গ্রামীণ মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। সেজন্য এখনো বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির পুরো সুবিধা পেতে হলে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে, আরো বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ই-গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে উৎসাহী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

দলগত কাজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় নিয়ে একটি পোস্টার ডিজাইন কর।

অনুশীলনী

১. লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম ইঞ্জিন কত সালে তৈরি করে?

ক. ১৮৩৩ খ. ১৮৪২
গ. ১৯৫৩ ঘ. ১৯৯১

২. কোন আবিষ্কারকের আবিষ্কারের ফলে আজকের পৃথিবীতে ঘরে বসেই অফিসের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে?

ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. অ্যাডা লাভলেস
গ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঘ. জগদীশ চন্দ্র বসু

৩. ফেসবুকের নির্মাতা কে?

ক. স্টিভ জবস খ. বিল গেটস
গ. মার্ক জাকারবার্গ ঘ. টিম বার্নার্স লি

৪. সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে–

i. স্বল্পসময়ে সরকারি সেবা পাওয়া যাবে
ii. সরকারি সেবার মান উন্নত হবে
iii. ছুটির দিনেও অনেক সরকারি সেবা পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুমন সেন্টমার্টিন বেড়াতে যেয়ে অসুস্থ হয়ে গেলে ফোনে সে ঢাকায় একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে। তিনি সুমনকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে বলেন। পরে হাসপাতালের ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে সুমনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

৫. স্থানীয় ডাক্তার যে পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন তা হলো-

i. টেলিমেডিসিন সেবা
ii. ই-স্বাস্থ্যসেবা
iii. ই- কমার্স সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. সুমনের চিকিৎসায় কোন প্রযুক্তিটির ভূমিকা প্রধান?

ক. আইসিটি খ. টেলিভিশন
গ. রোবট ঘ. কম্পিউটার

৭. কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার যাদুর চর গ্রামের মিলন বাড়িতে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে?

৮. বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর।

২০২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- Software uninstall এবং Software delete -এর পার্থক্য করতে পারব;
- কম্পিউটার, তথ্য-উপাত্ত ও Software -এর নিরাপত্তায় পাসওয়ার্ড ও এন্টি ভাইরাস ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সাধারণ ও সামাজিক সাইটসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
- অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- অতিমাত্রায় গেমস্ খেলার নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সফটওয়্যার পাইরেসির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারব;
- কপিরাইট আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে সাথে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের ট্রাবল শ্যুটিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নির্দিষ্ট Software install/uninstall করতে পারব;
- Unique পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারব;
- কম্পিউটারের সাধারণ সমস্যার ট্রাবলশ্যুট করতে পারব।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

ঘটনা ১ : রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আস্তে আস্তে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

ঘটনা ২ : অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শর্টকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উপরের ঘটনা দুটো থেকে তোমরা কী বুঝলে? তোমাদের অনেকের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যাচ্ছে? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে এতদিনে তোমাদের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই হলো মূল যন্ত্র। নতুন একটি কম্পিউটার তা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট যাই হোক না কেন দেখবে খুব ভালো বা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করার পরে দেখবে এটি ক্রমশ ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরনো হলে যন্ত্রটি কেমন যেন ধীর হয়ে যায়। অনেক সময় একটি কমান্ড দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, রাগান্বিত হয়ে আরেকটি নতুন কম্পিউটার কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে!

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাহলে কী? এখানেই রয়েছে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব। নিচের শ্রেণিতে তোমরা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছ। বেশিরভাগ মানুষেরই আইসিটি যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তারপরও এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার আইসিটি যন্ত্র বা কম্পিউটারটি সচল ও পূর্ণমাত্রায় কার্যক্ষম রাখতে চাও তবে অবশ্যই এটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একাজের জন্য তোমার যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আসলে আমরা এখানে আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছি।

তোমার আইসিটি যন্ত্রটিতে যদি মাইক্রোসফট কোম্পানির উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়) থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম সবসময় হালনাগাদ বা আপডেট করতে হবে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে এ আপডেটগুলো সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমও প্রায় একই ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া তোমাকে অবশ্যই মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটারকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য। যদি রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ব্যবহার না কর তোমার কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না এবং তোমার জন্য অনেক সময় বিরক্তির কারণ হবে।

এছাড়াও প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় বেশকিছু টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়। অনেকদিন এ ফাইলগুলো না মুছে দিলে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা দখল করে রাখে এবং কম্পিউটারের গতিকে ধীর করে দেয়। সে জন্য আমাদের সবারই উচিত সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে টেম্পোরারি ফাইলগুলো মুছে দেওয়া। এতে হার্ডডিস্কের বেশ খানিকটা জায়গা খালি হবে আবার কম্পিউটারের কাজ করার গতিও বেড়ে যাবে অনেক।

ইদানীং ইন্টারনেট ব্যবহার করা ছাড়া আইসিটি যন্ত্রের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তোমার ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে অনেক কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়। এতে আইসিটি যন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে যায়। প্রতিদিন সম্ভব না হলেও কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজটি করতে সফটওয়্যার তোমাকে সাহায্য করবে।

এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া বর্তমানে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এধরনের সফ্‌টওয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্র ব্যবহারকারীগণ তাদের যন্ত্রে ভাইরাসসহ ম্যালওয়্যার বা স্পাইওয়্যারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাশাপাশি নির্বিঘ্নে তাদের যন্ত্র বা যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখন অনেক এন্টিভাইরাস এবং এন্টি ম্যালওয়্যার বা এন্টি স্পাইওয়্যার বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। এমনকি এ সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপডেট করা যায়। হালনাগাদ বা আপডেটেড এন্টিভাইরাস ছাড়া আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য প্রায় সব ব্যবহারকারী ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার ব্যবহার করে থাকে। এ প্রোগ্রামগুলো সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। এ সফটওয়্যার দুটো হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো এমনভাবে সাজায় যাতে কম্পিউটার গতি বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও আনইনস্টলেশন

আমরা সবাই জানি আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে ইনস্টল করতে হয়। আমরা যখন কোনো আইসিটি যন্ত্র কিনি তখন বিক্রেতা সাধারণত আমাদের জিজ্ঞাসা করে আমাদের কোন কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন। অতঃপর অপারেটিং সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে বিক্রেতা যন্ত্রটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। এভাবে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমতো আইসিটি যন্ত্র তথা কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া একটু জটিল এবং এর জন্য কিছু বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়াও আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ইনস্টল করতে হয়।

কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন:

- ➢ যে সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে তা তোমার যন্ত্রের হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা;
- ➢ read me ফাইলটিতে জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা আছে কিনা পড়ে নিতে হবে;
- ➢ ইনস্টলেশনের সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ আছে কিনা (বন্ধ না থাকলে অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে ঝামেলা হয়);
- ➢ এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ আছে কিনা; এবং
- ➢ অপারেটিং সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা (বিশেষ কোনো যন্ত্র ছাড়া প্রায় সব যন্ত্রেরই এ অনুমোদন দেওয়া থাকে)।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া অনেকটাই অপারেটিং সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। তবে এ প্রক্রিয়া অনেকটা একই ধরনের। কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে প্রথমেই আমাদের সফটওয়্যারটির সফট বা ডিজিটাল কপি প্রয়োজন হবে। এ সফট কপিটি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফটওয়্যারগুলোর সাথে Auto run নামে একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। তোমাদের কম্পিউটারে সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে Auto run প্রোগ্রামটি সচল হয়ে যায় এবং সফটওয়্যারটি setup করার অনুমতি চায়। অনুমতি প্রদান করার পর পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করলেই সফটওয়্যারটি তোমার যন্ত্রে ইনস্টল হয়ে যাবে। সাধারণত যন্ত্রটি restart করলেই ইনস্টলকৃত প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা শুরু করা যায়।

একটি সফটওয়্যার ইনস্টল করার ধাপগুলো দেখানো হলো :

প্রথমে সফটওয়্যারের সেটআপ ফাইলে ডাবল ক্লিক করতে হবে। যেমন, নিচের চিত্র-১ একটি সেটআপ ফাইল। এটাতে ডাবল ক্লিক করলে ইনস্টলেশন শুরু হবে।
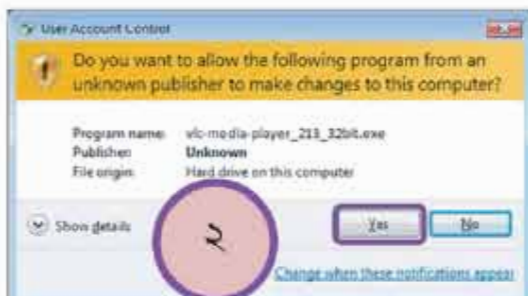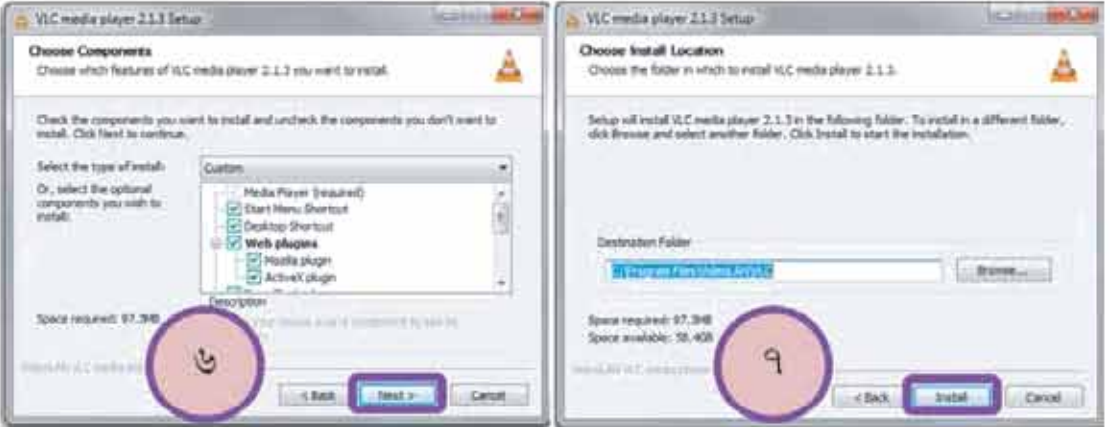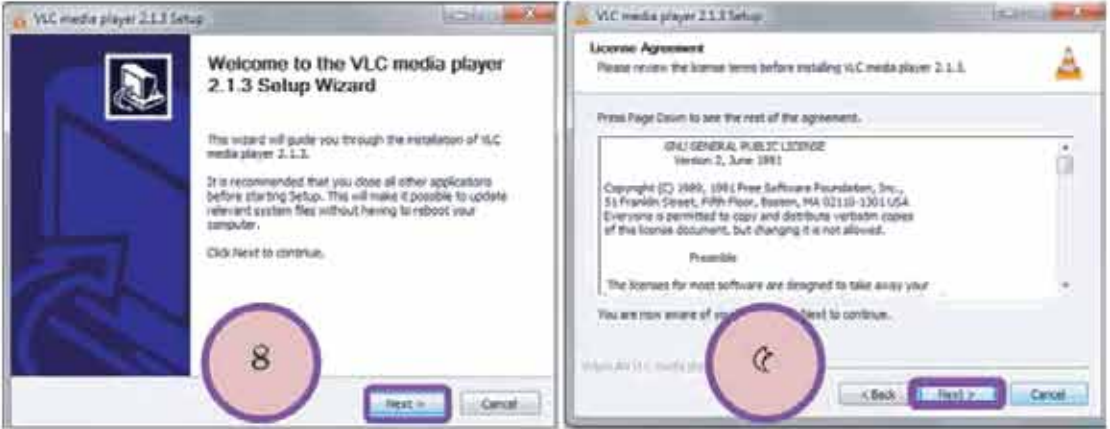
উপরের ধাপগুলো প্রায় সব ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কাজ

প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার ইনস্টল কর।

সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন

ইনস্টল করতে শিখে ফেললে। এখন মনে কর ইনস্টল করা কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার আর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা কী করব? বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সফটওয়্যারটি তার যন্ত্রেই রেখে দেয়। কিন্তু

এতে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। আবার অনেক সময় আইসিটি যন্ত্রটি পরিচালনা করতে ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আনইনস্টল করে ফেলা।

এখন প্রশ্ন হলো আনইনস্টল কীভাবে করব? এ কাজটি করতেও অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আমাদের সাহায্য করে থাকে। প্রায় সব অপারেটিং সিস্টেমের কাজের ধরন একই। তবে এন্ড্রয়েড চালিত যন্ত্র বিশেষ করে হাতের আঙুলের স্পর্শ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ টাচস্ক্রিনযুক্ত স্মার্টফোনগুলো থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করা খুবই সহজ। সেটিংস থেকে অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটিতে টাচ করলে পর্দায় একটি মেনু আসবে। সেখানে আনইনস্টল লেখা জায়গায় টাচ করার পর সফটওয়্যারটি আনইনস্টল হয়ে যাবে।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ-এর অপারেটিং সিস্টেম যা কিনা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আইসিটি যন্ত্রে তথা কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকে, সেসব যন্ত্র হতে সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে। অতঃপর ডাবল ক্লিক করে 'অ্যাড অর রিমুভ' অথবা 'আনইনস্টল প্রোগ্রাম' -এ ঢুকতে হবে।

এরপর যে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করতে চাও সেটি খুঁজে ক্লিক করে আনইনস্টলে ক্লিক করলেই ফাইলটি আনইনস্টল হতে শুরু করবে। ফাইল বড় হলে আনইনস্টল হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। তবে কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করার সময় নিশ্চিত হয়ে তা করতে হবে। অন্যথায় ভুলক্রমে এমন সফটওয়্যার আনইনস্টল হতে পারে, যার কারণে তোমার যন্ত্রটিতে পুনরায় সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা ছাড়া চালানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

কাজ

প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার আনইনস্টল কর।

সফটওয়্যার ডিলিট

আমরা জানি ডিলিট অর্থ মুছে ফেলা। মূলত সফটওয়্যার আনইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের আইসিটি যন্ত্র হতে ইনস্টল করা যেকোনো সফটওয়্যার মুছে ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে তাহলে ডিলিট দিয়ে কী করব? কম্পিউটার বা অন্য যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে কোনো সফটওয়্যার একবার ইনস্টল করলে আনইনস্টলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। আবার নিয়ম না মেনে শুধু সফটওয়্যারটি ডিলিট করে দিলে সফটওয়্যারটি মুছে তো যায়ই না বরং আরো সমস্যা তৈরি করে। আনইনস্টল করলে সফটওয়্যারটির কিছু অংশ অপারেটিং সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম অনুসরণ করে ডিলিট করলে যেকোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভব। নিচে নিয়মটি দেখানো হলো। এ কাজটি করতেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ডিলিট করতে যা করতে হবে : প্রথমে পূর্বের নিয়মে সফটওয়্যারটি আনইনস্টল করতে হবে। পরে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।
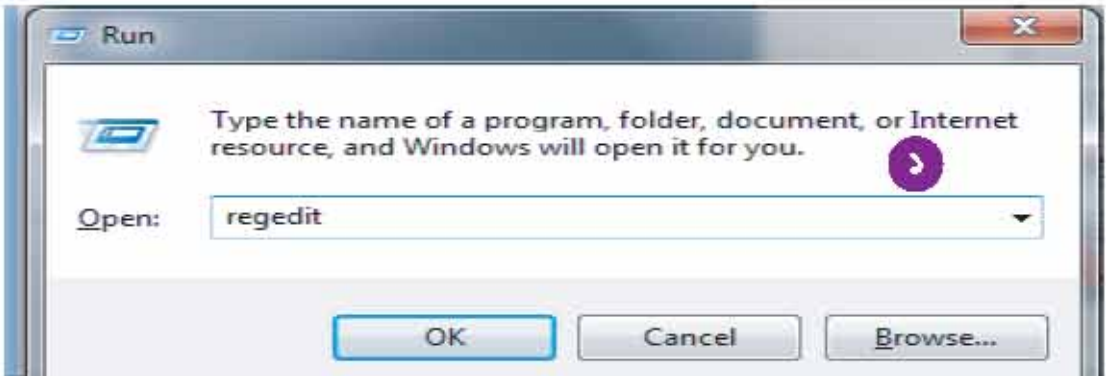
১. প্রথমে কীবোর্ডের [Windows key] + r একসাথে চেপে Run Command চালু করতে হবে। তারপর regedit লিখে ok বাটন ক্লিক করতে হবে।

২. ফাইল মেনুতে প্রবেশ করতে হবে।

৩. Export -এ ক্লিক করতে হবে।
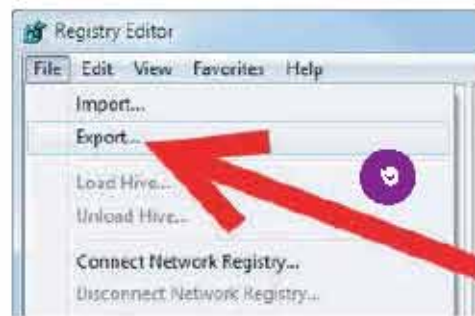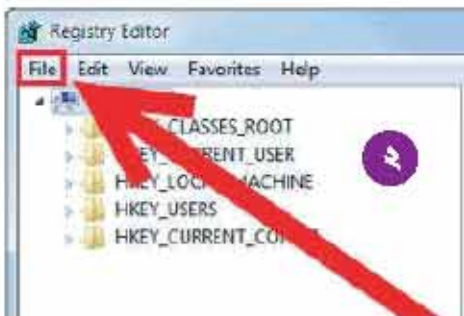
৪. অপারেটিং সফটওয়্যার যে ড্রাইভে রয়েছে অর্থাৎ C সিলেক্ট করতে হবে।

৫. নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করতে হবে। এটি খুবই জরুরি। কোনো ভুল হলে যাতে সিস্টেম ঠিক করা যায়।

৬. অতঃপর Edit -এ প্রবেশ করতে হবে।
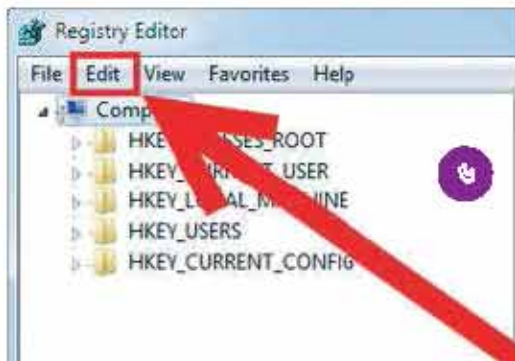
৭. Find -এ যেতে হবে।

৮. যে সফটওয়্যারটি ডিলিট করতে চাই তার নাম খুঁজতে হবে, যেমন এখানে AUDIALS

৯. Find Next -এ ক্লিক করতে হবে।

১০. এভাবে সিলেক্ট করতে হবে।

১১. এবার ডান বাটন ক্লিক করে Delete -এ ক্লিক করে করতে হবে।
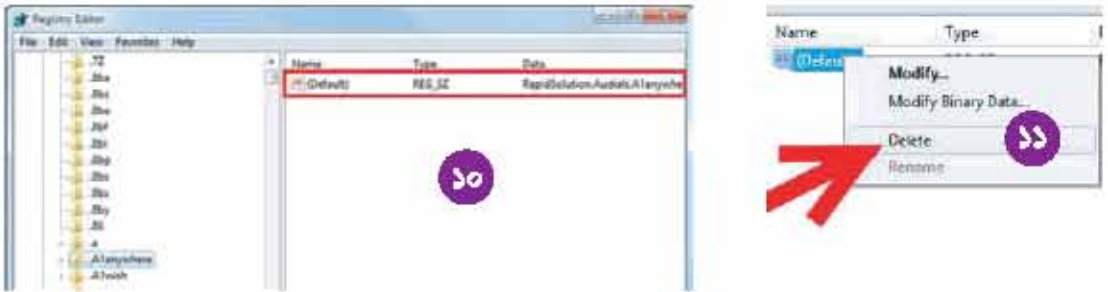
১২. সবশেষে কীবোর্ডের F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ঐ নামের ফাইলগুলো মুছে দিতে হবে। এভাবেই সম্পূর্ণ হবে পুরো সফটওয়্যার ডিলিট করার প্রক্রিয়া।

দলগত কাজ

আনইনস্টল এবং ডিলিটের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

নিজের কম্পিউটারের নিরাপত্তা – কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাস বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছি। তবু আমাদের আইসিটি যন্ত্রের নিরাপত্তার কথাটি মাথায় রেখে এ বিষয়ে আরও জানা প্রয়োজন। প্রাণীদেহে ভাইরাস আক্রমণের মতোই এ ভাইরাসগুলো আমাদের আইসিটি যন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে। VIRUS শব্দের পূর্ণরূপ হলো Vital Information Resources Under Siege যার অর্থ দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দখলে নেওয়া বা ক্ষতি সাধন করা। ১৯৮৩ সালে এ নামকরণ করেছেন প্রখ্যাত গবেষক 'University of New Haven'-এর অধ্যাপক ফ্রেড কোহেন (Fred Cohen)। ভাইরাস হলো এক ধরনের সফটওয়্যার যা তথ্য ও উপাত্তকে আক্রমণ করে এবং যার নিজের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে। ভাইরাস কম্পিউটারে প্রবেশ করলে সাধারণত সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে গোটা কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রকে সংক্রমিত করে অচল করে দেয়। যেমন- বুট ভাইরাস ডিস্কের বুট সেক্টরকে আক্রমণ করে। অতি পরিচিত কিছু ভাইরাস হলো স্টোন (Stone), ভিয়েনা (Vienna), সিআইএইচ (CIH), ফোল্ডার (Folder), Trojan Horse ইত্যাদি।

কোনোভাবে কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাসে সংক্রমিত হলে তা ক্রমে ক্রমে বিস্তার ঘটে। সিডি, পেনড্রাইভ কিংবা অন্য যেকোনোভাবে ভাইরাসযুক্ত একটি ফাইল ভাইরাসমুক্ত কম্পিউটার বা কোনো আইসিটি যন্ত্রে চালালে ফাইলের সংক্রমিত ভাইরাস কম্পিউটার বা যন্ত্রটির মেমোরিতে অবস্থান নেয়। কাজ শেষ করে ফাইল বন্ধ করলেও সংক্রমিত ভাইরাসটি মেমোরিতে রয়েই যায়। ফলে ভাইরাসমুক্ত কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একই অবস্থা ঘটে কোনো ভাইরাস সংক্রমিত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার চালালেও।

এভাবে মেমোরিতে স্থান দখলকারী ভাইরাস পরবর্তীতে অন্যান্য প্রোগ্রাম এবং ফাইলকেও আক্রমণ করে। কোনো কোনো ভাইরাস তাৎক্ষণিকভাবে সকল প্রোগ্রাম ও ফাইলকে গ্রাস করে, আবার কোনো কোনো ভাইরাস শুধু নতুন প্রোগ্রাম ও ফাইলকেই আক্রান্ত করে। ফাইল ও প্রোগ্রামসমূহ গ্রাস করতে করতে ভাইরাস তার ইচ্ছামতো কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সার্বিক ক্ষতিসাধন শুরু করে। এভাবে একটি ভাইরাসমুক্ত কম্পিউটার ধীরে ধীরে ভাইরাসে সংক্রমিত হয় এবং উক্ত সংক্রমিত কম্পিউটারে ব্যবহৃত সিডি, হার্ডডিস্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাসটি অন্যান্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে।

কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহঃ

- প্রোগ্রাম ও ফাইল Open করতে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে;
- মেমোরি কম দেখাচ্ছে ফলে গতি কমে গেছে;
- কম্পিউটার চালু অবস্থায় চলমান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছু অপ্রত্যাশিত বার্তা প্রদর্শিত হচ্ছে;
- নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টলের ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগছে;
- চলমান কাজের ফাইলগুলো বেশি জায়গা দখল করছে;
- যন্ত্র চালু করার সময় চালু হতে হতে বন্ধ বা শাট ডাউন হয়ে যাচ্ছে কিংবা কাজ করতে করতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা রিস্টার্ট হচ্ছে;
- ফোল্ডারে বিদ্যমান ফাইলগুলোর নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে ইত্যাদি।

ভাইরাস সাধারণত যা যা ক্ষতি করতে পারে :

- কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোনো ফাইল মুছে দিতে পারে;
- ডেটা বিকৃত বা Corrupt করে দিতে পারে;
- কম্পিউটারে কাজ করার সময় আচমকা অবাঞ্ছিত বার্তা প্রদর্শন করতে পারে;
- কম্পিউটার মনিটরের ডিসপ্লেকে বিকৃত বা Corrupt করে দিতে পারে;
- সিস্টেমের কাজকে ধীরগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে, ইত্যাদি।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমরা কী করতে পারি? এখানেই এন্টিভাইরাসের কথা এসে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এন্টিভাইরাস আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ভাইরাসের প্রতিষেধক হলো এন্টিভাইরাস। সিস্টেম ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এটি নির্মূল করতে হয়। ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এন্টিভাইরাস ইউটিলিটি ব্যবহার করা হয়। এই ইউটিলিটিগুলো প্রথমে আক্রান্ত কম্পিউটারে ভাইরাসের চিহ্নের সাথে পরিচিত ভাইরাসের চিহ্নগুলোর মিলকরণ করে। অতঃপর

এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি তার পূর্বজ্ঞান ব্যবহার করে সংক্রমিত অবস্থান থেকে আসল প্রোগ্রামকে ঠিক করে। একটি ভালো এন্টিভাইরাস সাধারণভাবে প্রায় সব ধরনের ভাইরাস নির্মূল করতে পারে। নতুন ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে এন্টিভাইরাস Update করলে এর শক্তি ও কার্যক্ষমতা প্রতিনিয়ত উন্নত হয়। ফলে নতুন নতুন ভাইরাস ধ্বংস করতে পারে। বর্তমানে অনেক এন্টিভাইরাস রয়েছে যেগুলো ভাইরাস চিহ্নিত করে, নির্মূল করে এবং প্রতিহত করে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার দেওয়া থাকে। এছাড়াও এখনকার এন্টিভাইরাসগুলো ভাইরাস আক্রমণ করার পূর্বেই তা ধ্বংস করে অথবা ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে। ফলে এগুলো পূর্বের এন্টিভাইরাসের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। এখানে একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার সবসময় আপডেট রাখতে হবে।

ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে আইসিটি যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা অনেকাংশ নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখযোগ্য কিছু এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামের নাম হলো-

- এভিজি এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avg.com)
- এভিরা এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avira.com)
- এভাস্ট এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avast.com)

কম্পিউটার বা আমাদের আইসিটি যন্ত্রগুলোকে ভাইরাসমুক্ত রেখে ব্যবহার করতে আমরা নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারি।

১. অন্য যন্ত্রে ব্যবহৃত সিডি, পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি নিজের যন্ত্রে ব্যবহারের পূর্বে ভাইরাস মুক্ত করে নেয়া। (এন্টি ভাইরাস দ্বারা স্ক্যান করে নেওয়া)
২. অন্য কম্পিউটার থেকে কপিকৃত সফ্‌টওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের আগে সফ্‌টওয়্যারটিকে ভাইরাস মুক্ত করা।
৩. অন্য যন্ত্রের কোনো ফাইল নিজের যন্ত্রে ব্যবহারের পূর্বে ফাইলটিকে ভাইরাস মুক্ত করা।
৪. ইন্টারনেট থেকে কোনো সফ্‌টওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে ইনস্টল করার সময়ে সতর্ক থাকা। কারণ, ডাউনলোডকৃত সফ্‌টওয়্যারে ভাইরাস থাকলে তা থেকে তোমার কম্পিউটারটিও ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারে।
৫. অন্যান্য কম্পিউটারে বা যন্ত্রে ব্যবহৃত সফ্‌টওয়্যার কপি করে ব্যবহার না করা।
৬. কম্পিউটারে ভাইরাস প্রবেশ করলে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদর্শন করার জন্য এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যারটিকে হালনাগাদ করে রাখা প্রয়োজন।
৭. প্রতিদিনের ব্যবহৃত তথ্য বা ফাইলসমূহ আলাদা কোনো ডিস্ক বা পেনড্রাইভে ব্যাকআপ রাখা, তবে এক্ষেত্রে ডিস্ক বা পেনড্রাইভটি অবশ্যই ভাইরাস মুক্ত হতে হবে।
৮. ই-মেইল আদান-প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা। যেমন : সন্দেহজনক সোর্স থেকে আগত ই-মেইল open না করা। করলেও ভাইরাসমুক্ত করে তা খোলা উচিত।
৯. গেম ফাইল ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভাইরাস চেক করতে হবে।

পাসওয়ার্ড

পরিবারের সবাই বাড়ির বাইরে বেড়াতে গেলে সাধারণত আমরা বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে যাই। কেন? বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, তাই না। এখন একটু চিন্তা কর, তালা জিনিসটা আসলে কী? যে কেউ যেকোনো চাবি দিয়ে তোমার বাড়ির তালাটি খুলতে পারে না। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটি তালার জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাবি রয়েছে। এক তালার চাবি দিয়ে অন্য একটি তালা খোলা যায় না। এভাবে আমরা তালা দিয়ে আমাদের বাড়িসহ অন্যান্য জিনিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। এখন অবশ্য নম্বর দেওয়া এক ধরনের তালা দেখা যায়, যেখানে নম্বর মিলিয়ে তালাটি খুলতে হয়। এক্ষেত্রে নম্বরটি চাবির কাজ করে। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির এ যুগে আরো অনেক কিছুর নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ কীসের কথা বলছি।

ঠিক ধরেছ, আমরা আমাদের তথ্য ও উপাত্তের নিরাপত্তার কথা বলছি। আইসিটির এ যুগে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত ও সফটওয়্যার নিরাপত্তায় এক ধরনের তালা দিতে হয়। এ তালার নাম পাসওয়ার্ড।

তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পাসওয়ার্ড তৈরি ও ব্যবহার করে ফেলেছ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সবখানে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এর প্রসার যত বাড়ছে নিরাপত্তার প্রশ্নটি তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের ব্যক্তিগত সকল তথ্য যেমন ব্যাংক একাউন্ট, আয়করের হিসাব, চাকরির বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদি ছাড়াও নানা তথ্য-উপাত্ত এখন ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আসছে। এছাড়াও আমাদের আইসিটি যন্ত্রপাতি যেমন– কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা মোবাইল ফোনগুলো সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করি তখন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের সাথে যোগযোগ করতে পারি। তেমনি অন্য যে কেউ আমাদের যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্যও অন্যের কাছে চলে যেতে পারে কিংবা কেউ আমাদের যন্ত্রের সফটওয়্যারের ক্ষতি করতে পারে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। এসব তথ্য ও আমাদের যন্ত্রের সফটওয়্যারসমূহ রক্ষা করতে পাসওয়ার্ডের কোনো বিকল্প নেই। পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকলে যে কেউ ইচ্ছা করলেই আমাদের তথ্য নিতে পারবে না বা ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যদি কেউ বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা যে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম তা ধরে ফেলতে পারে তাহলে সে আমাদের সকল তথ্য নিয়ে নিতে পারবে। তথ্য নষ্ট করতে চাইলে নষ্ট করতে পারবে। অনেকটা ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে তালা খুলে ফেলার মতো। তাই পাসওয়ার্ড তৈরি করতে আমাদের অনেক দক্ষ হতে হবে। অন্য কেউ ধারণা করতে পারে এমন সহজ পাসওয়ার্ড যেমন তৈরি করা যাবে না আবার নিজেই ভুলে যেতে পারি এমন পাসওয়ার্ড তৈরি করা যাবে না।

বেশিরভাগ মানুষ 123456 বা 654321 বা abcdef এ ধরনের পাসওয়ার্ড তৈরি করে। ফলে পাসওয়ার্ড জেনে যাওয়া বা ধরে ফেলা সহজ হয়। যদিও অনেক ব্যবহারকারী অনন্য বা Unique পাসওয়ার্ড তৈরি করাকে ঝামেলার কাজ মনে করে। তথ্য-উপাত্তের দিকটি বিবেচনায় নিলে Unique বা মৌলিক পাসওয়ার্ড তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সার্ভার, কম্পিউটার বা যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে রক্ষিত তথ্য ও উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে

গোপনীয়তা বজায় রাখার কাজটিও পাসওয়ার্ড করে থাকে। তোমার পাসওয়ার্ড যদি Unique না হয় তবে:

১. দুর্বল পাসওয়ার্ডের কারণে ভাইরাস সহজেই আক্রমণ করতে পারে।

২. হ্যাকারদের সহজেই হ্যাক করার সুযোগ করে দিতে পারে। এতে তোমার ব্যাংকে রাখা টাকা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যের হাতে চলে যেতে পারে।

৩. তোমার সহজ পাসওয়ার্ডের কারণে আইসিটি যন্ত্রে রক্ষিত তথ্য নষ্ট করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

কীভাবে মৌলিক পাসওয়ার্ড তৈরি করা যায়? এটি একটি সৃজনশীল কাজ। তোমার সৃজনশীলতাই তোমার তথ্য বা সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চললে কাজটি করতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

Unique পাসওয়ার্ড তৈরির সময় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে:

- নিজের বা পরিবারের কারো নাম বা ব্যক্তিগত কোনো তথ্য সরাসরি ব্যবহার না করা। যদিও পাসওয়ার্ডটি মনে রাখার ক্ষেত্রে এটি আমাদের সাহায্য করে থাকে।
- সংখ্যা, চিহ্ন ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছোট হাতের অক্ষর ও বড় হাতের অক্ষর মিশিয়ে দিলে ভালো হয়। এতে পাসওয়ার্ডটি সম্পর্কে অন্যের ধারণা করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে।
- পাসওয়ার্ডটি যেন অবশ্যই একটু বড় আকারের হয়।
- পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য আইসিটি যন্ত্র বা ডায়রি বা অন্য কোথাও পাসওয়ার্ড বা এর অংশবিশেষ লিখে না রাখা।
- পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য নিজের পছন্দের একটি সংকেত ব্যবহার করা। এটি হতে পারে প্রিয় কবিতা, গল্প, লেখক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ কাজগুলোর সাথে যদি সৃজনশীলতা যোগ হয় তবে পাসওয়ার্ডটি হয়ে উঠতে পারে Unique পাসওয়ার্ড। আমাদের পাসওয়ার্ডগুলো হতে পারে এমন-

- MoriTeChaHina_AmiSunDarVhubanE (প্রাণ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর);
- AmAr_AchE_wateR (হুমায়ূন আহমেদ);
- 2BornoT2B_tHatisThe? (To be or not to be, that is the question- From Shakespeare);
- 4Score&7yrsAGO (Four score and seven years ago- From the Gettysburg Address), ইত্যাদি।

> কাজ
>
> প্রত্যেকে একটি করে পাসওয়ার্ড তৈরি করে উপস্থাপন কর।

তবে পাসওয়ার্ড অবশ্যই মনে রাখার মত হওয়া উচিত। প্রায়শ পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করাও একটি জরুরি কাজ। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের তথ্য ও সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে সক্ষম হব।

ওয়েবে নিরাপদ থাকা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল, কম্পিউটারের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি ইন্টারনেট বা অনলাইনের ব্যবহারও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

যখনই কোনো কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস (ফোন, প্যাড, ট্যাব ইত্যাদি) অনলাইনে যুক্ত থাকে তখনই এর নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়। সতর্কতা এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ঝুঁকি কমানো যায়।

একজন অনলাইন ব্যবহারকারী নানান কারণে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়েবে নিরাপদ থাকার বিষয়টি আলোচনা করা হলো -

ক. সাধারণ সাইট : ব্যবহারকারীদের অনেকেই ইয়াহু, হটমেইল বা জিমেইলের মতো সাধারণ এবং বিনামূল্যের ই-মেইল সেবা ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর প্রতিটি সাইটে একাউন্ট হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হ্যাক হলে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় মেইল হারিয়ে যেতে পারে। আবার ঐ একাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা বা অনুরূপ কাজ হতে পারে যার দায়-দায়িত্ব ব্যবহারকারীর ওপর বর্তায়।

এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাধারণ সতর্কতাগুলো মেনে চলা দরকার

- সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা - অনেকেই তাদের ই-মেইল একাউন্টের পাসওয়ার্ড হিসাবে নিজের নাম, কীবোর্ডের সহজ বিন্যাস (যেমন qwerty বা asdfg বা ১২৩৪৫৬৯৭৮) ব্যবহার করে। এটি মোটেই সংগত নয়। কারণ ই-মেইলের ক্ষেত্রে ই-মেইল একাউন্ট-ই ব্যবহারকারীর নাম, যা প্রায় সবাই জানে। যে কারণে পাসওয়ার্ডটি যদি সহজ হয় তাহলে যে কেউ মাত্র কয়েকবারের চেষ্টাতেই একাউন্টটি হ্যাক করতে পারবে। এজন্য একটি জটিল বিন্যাস ব্যবহার করা উচিত পাসওয়ার্ড হিসাবে। এবং এতে অক্ষর, সংখ্যা বিশেষ চিহ্ন (!@# ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত।
- নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা : কিছুদিন পর পর ই-মেইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- যেসব ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা। যেমন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জিমেইল অ্যাকাউন্টটির নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা যায়। এ জন্য জিমেইলের 2 Step Verificaton অপশনটি ব্যবহার করতে হবে।
  - ➢ প্রোফাইল থেকে অ্যাকাউন্ট সেটিংয়ে যেতে হবে।
  - ➢ 2-step verification এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে।
  - ➢ মোবাইলের নম্বরটি দিতে হবে এবং সেন্ড কোড বাটনে ক্লিক করতে হবে।
  - ➢ জিমেইল থেকে মোবাইলে একটি সিকিউরিটি কোড পাঠানো হবে। সেটি দিয়ে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করতে হবে।
  - ➢ এরপর 2-step verificationটি অন করতে হবে।

এখন কেউ এই অ্যাকাউন্টে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইলে তাকে মোবাইল কোডটি পেতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কোডটি একবার মাত্র ব্যবহার করা যাবে সুতরাং কেউ আগের কোডটি জানতে পারলেও অ্যাকাউন্টটি থাকবে নিরাপদ। একইভাবে ইয়াহু! মেইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সাইবার ক্যাফে বা অনেকেই ব্যবহার করে এমন কোনো কম্পিউটার থেকে ই-মেইল ব্যবহার করলে, ব্যবহার শেষে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট থেকে লগ-আউট করতে হবে।

এছাড়া সাধারণ ওয়েবসাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু বাড়তি সতর্কতা মেনে চললে নিরাপদ থাকা যায়। অনেক ওয়েবসাইটে বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম ইনস্টল করা থাকে। ওয়েব ব্রাউজারে কুকিজ চালু থাকলে এসব সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর কম্পিউটার ও ব্রাউজারের বিভিন্ন তথ্য অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। এসব ওয়েবসাইট

ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো কোনো ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চায়। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এই সকল তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

খ. সামাজিক সাইট : বর্তমানে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য রেখে দেন। ব্যক্তিগত ছবিও অনেকে শেয়ার করে থাকে। ফলে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড কেউ জেনে ফেললে তাতে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ই-মেইল সাইটে যে সকল নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মতো অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের সাইট ব্যবহারের সময় নিম্নোক্ত সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন :

- কাউকে 'বন্ধু' বানানোর আগে তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, বাস্তব জীবনে যে তোমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়, তাকে বন্ধু না করা ;
- অপরিচিত কাউকে বন্ধু বানানোর সময় তার পরিচয় সম্পর্কে সম্যকভাবে নিশ্চিত হওয়া, এজন্য তার প্রোফাইল দেখা, পারস্পরিক বন্ধুদের মধ্যে কেউ তোমার পরিচিত কি-না সেসব বিষয় দেখে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ;
- খুবই ব্যক্তিগত ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা ;
- মোবাইলে ফেসবুক/ই-মেইল ব্যবহার করার পর প্রতিবারই লগআউট করা ;
- স্কুল, সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করার পর সাইন আউট করা ;
- বন্ধুর বা পরিচিত কারো কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা ; এবং
- কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ফেসবুক এপ্লিকেশন ব্যবহারের অনুরোধ এলে, নিশ্চিত না হয়ে তাতে ক্লিক না করা।

গ. বয়সোপযোগী সাইট : ওয়েবে অনেক সাইট রয়েছে যা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এই সকল সাইটে বয়সোপযোগী নানান বিষয় থাকে যা তোমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এ ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত তথা যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে দৃশ্যমান অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র বা বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তোমাদের তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে নৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি বলে একটা ভীতিকর শব্দ আছে এবং সবাই নিশ্চয়ই এর সাথে পরিচিত। সাধারণত আসক্তি শব্দটা ব্যবহৃত হয় মাদকের সাথে। কোনো একজন ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে গেলে তার জীবনটা কেমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসা কত কঠিন আমরা সবাই সেটা জানি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির পাঠ্যবইয়ে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারের মতো এমন চমৎকার একটা বিষয়ের সাথে আসক্তির মতো ভয়ংকর একটা নেতিবাচক শব্দ কেমন করে জুড়ে দেওয়া হলো সেটি নিয়ে তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। তোমাদের ভেতর

যাদের কম্পিউটার আছে, তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কম্পিউটার গেম খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, খেলা বন্ধ করে যখন অন্য একটা জরুরি কাজ করা দরকার তখনো খেলা ছেড়ে উঠতে পারছ না, এরকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কারো কারো হয়েছে। যাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের যোগাযোগ আছে তাদের কারো কারো হয়তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই ফেসবুকে তুমি সম্ভবত নিজের সম্পর্কে কোনো তথ্য দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছ কখন সেখানে কেউ লাইক দেবে। ফেসবুকে তোমার বন্ধু বাড়লে তুমি হয়তো আনন্দ পেয়েছ এবং ঠিক কম্পিউটার গেমের মতোই ফেসবুক নামে সামাজিক নেটওয়ার্কে তোমার যতটুকু সময় দেওয়া উচিত তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশি সময় দিয়েছ। এটা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয় যে তুমি যদি ফেসবুকে এত সময় না দিতে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফল আরেকটু ভালো হতো। তুমি আরো কয়েকটা চমৎকার বই পড়তে পারতে। মাঠে আরো একটু বেশি খেলতে পারতে। ভাই-বোন, বাবা-মাকে আরেকটু বেশি সময় দিতে পারতে।

তোমাদের অনেকে কম্পিউটার গেম কিংবা ফেসবুকের মতো কোনো একটা সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় কর। এতে সত্যিকারের জীবনের খানিকটা হলেও ক্ষতি করছ যারা এমনটি করছ তারা নিশ্চয়ই এখন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট নামে ইতিবাচক শব্দটির সাথে আসক্তি নামের নেতিবাচক শব্দটা জুড়ে দেওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছ। আসক্তি বলতে বোঝানো হয় যখন কেউ জানে কাজটি করা ঠিক হচ্ছে না তারপরও সেই কাজটি না করে থাকতে পারে না। মাদকের জন্যে এটি যেমন হতে পারে ঠিক সেরকম কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সেটি হতে পারে। মাদক যেমন জীবনের জন্য ক্ষতিকর, বাড়াবাড়ি করা হলে কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেটও সে রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কম্পিউটার গেমে আসক্তি

কম্পিউটার গেমে আসক্তিটা প্রায় সময়েই শুরু হয় শৈশব থেকে এবং বেশিরভাগ সময়ই সেটা ঘটে অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে। কম্পিউটার একটা Tool এবং এটা দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি সম্পর্কে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে অনেক সময়ই অভিভাবকরা ধরে নেন এটা দিয়ে যা কিছু করা হয় সেটাই বুঝি ভালো, তাই যখন তারা দেখেন তাদের সন্তানেরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তারা বুঝতে পারেন না তার মাঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন এবং এই বিনোদনের নানা রকম মাত্রা রয়েছে। যারা সেটি খেলছে তারা সেটাকে নিছক বিনোদন হিসেবে নিয়ে মাত্রার ভেতরে ব্যবহার করলে সেটি যেকোনো সুস্থ বিনোদনের মতোই হতে পারে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটি ঘটে না। দেখা গেছে একটি ছোটো শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। কোরিয়ায় একজন মানুষ টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, চীনের এক দম্পতি কম্পিউটার গেম খেলার অর্থ জোগাড় করতে তাদের শিশু সন্তানকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র কিছু নয় এবং একটু সতর্ক না থাকলে একজন খুব সহজেই আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কম্পিউটার কিংবা কম্পিউটার গেমে আসক্তির বিষয়টা যেহেতু নতুন, তাই সেগুলো নিয়ে গবেষণা এখনো খুব বেশি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে পুরো বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা আরো নিশ্চিতভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন। এখনই গবেষণায় দেখা গেছে কোনো একটা কম্পিউটার গেমে তীব্রভাবে আসক্ত একজন মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ উত্তেজক রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব হয়। শুধু তাই নয় যারা সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা করে কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কের গঠনেও এক ধরনের পরিবর্তন হয়ে যায়।

কাজেই কম্পিউটার গেম চমৎকার একটা বিনোদন হতে পারে– কিন্তু এতে আসক্ত হওয়া খুব সহজ এবং তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়, সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং মানুষের নিজেদের ভেতর সবসময়েই একধরনের সামাজিক যোগাযোগ ছিল– কিন্তু ইদানীং সামাজিক যোগাযোগের কথা বলা হলে সেটি মানব সভ্যতার সেই চিরন্তন সামাজিক যোগাযোগ বা সামাজিক নেটওয়ার্কের কথা না বুঝিয়ে ইন্টারনেট-নির্ভর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের নেটওয়ার্কের কথা বোঝানো হয়। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, টিকটক, লাইকি– এ ধরনের অনেক সামাজিক যোগাযোগ সাইট রয়েছে যেগুলোতে মানুষ নিজেদের পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এক সময় এই সাইটগুলো ছিল কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জন্যে, এখন সব বয়সী মানুষই সেটি ব্যবহার করে। শুধু যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে এটি ব্যবহার করে তা নয়, একটা বিশেষ আদর্শ বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়। যে উদ্দেশ্যে এটি শুরু হয়েছিল যদি এটি সেই উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটি কোনো সমস্যার জন্ম দিত না, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর জন্যেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং এখন এটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত বলা যায় এই সাইটগুলোর সাফল্য নির্ভর করে, সেগুলো কত দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের আসক্ত করতে পারে। পুরো কর্মপদ্ধতির মাঝেই যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে কত বেশিবার এবং কত বেশি সময় একজনকে এই সাইটগুলোতে টেনে আনা যায় এবং তাদেরকে দিয়ে কোনো একটা কিছু করানো যায়। যে যত বেশিবার এই সাইট ব্যবহার করবে সেই সাইটটি তত বেশি সফল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবশ্যই সেটি তত বেশি টাকা উপার্জন করবে। কাজেই কেউ যদি অত্যন্ত সতর্ক না থাকে তাহলে তার এই সাইটগুলোতে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে যাবার খুব বড় একটা আশঙ্কা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এই সাইটগুলো বিশ্লেষণ করে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আবিষ্কার করেছেন। সব মানুষের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করার একটা ব্যাপার রয়েছে কিংবা নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার এক ধরনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Narcissism বলে– সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে মানুষের এই সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে দেয়। সবার ভেতরই তখন নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জেনে হোক না জেনে হোক ব্যবহারকারীরা নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি তথ্য সবার সামনে উপস্থাপন করতে থাকে, কেউ সেটি দেখলে সে খুশি হয়, কেউ পছন্দ করলে আরো বেশি খুশি হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকটা আসক্তির মতো কাজ করে এবং একজন ব্যবহারকারী ঘণ্টার পর ঘন্টা এই যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সময় অপচয় করতে থাকে। সামাজিক যোগাযোগের এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে সারা পৃথিবীতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে।

আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায়

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মাদকের ন্যায় কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটেও আসক্তি হতে পারে। তাই মাদকে আসক্তির জন্যে যা যা সত্যি, কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগের সাইটে আসক্তির জন্যেও সেগুলো সত্যি। তাই আমরা বলতে পারি একবার আসক্ত হয়ে যাবার পর সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা থেকে কখনোই আসক্ত না হওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। যারা এই আসক্তির ব্যাপারটি জানে না তাদের পক্ষে আসক্ত হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তোমরা যারা এই লেখাগুলো পড়ছ, তারা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে যেন সহজেই আসক্ত না হয়ে যাও।

কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন, কাজেই যারা কম্পিউটার গেম খেলবে তাদেরকে জানতে হবে অন্য যেকোনো বিনোদনের জন্যে যেটা সত্যি কম্পিউটার গেম খেলার বেলাতেও সেটা সত্যি। কম্পিউটার এক ধরনের প্রযুক্তি। তাই অনেকেই কম্পিউটার ব্যবহার করে করা যেকোনো কাজকেই প্রযুক্তির এক ধরনের ব্যবহার বলে মনে করে, সেটা মোটেও সত্যি নয়। কম্পিউটার গেম খেলে মোটেও কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান হয় না, খেলার আনন্দটা হয়। কাজেই কখনোই কম্পিউটার গেম খেলার কারণে নিজের দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে তোমরা কখনো কম্পিউটার গেমে আসক্ত হবে না, ঠিক সেরকম তোমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকেও কম্পিউটার গেমে আসক্ত হতে দেবে না। যারা কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায়, তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে। যেমন তাদের মাথায় সার্বক্ষণিক শুধু সেই গেমটার ভাবনাই খেলা করে, যখনই তারা সেই গেমটি খেলতে বসে তাদের ভেতরে এক ধরনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা তৈরি করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। জোর করে তাদেরকে এই খেলা থেকে বিরত রাখা হলে তাদের শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, অনেক কষ্ট করে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া গেলেও হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে আবার সেই আসক্তি ফিরে আসতে পারে। যারা কোনো কারণে কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায় তারা যদি এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে সবার আগে নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হবে যে তাদের আসক্তি জন্মেছে। তারপর তাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী তার একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকায় কম্পিউটার গেমের জায়গাটুকু কোথায় সেটি নিজেকে বোঝাতে হবে। তার জীবনের সমস্যাগুলোরও একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকার সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি কম্পিউটার গেমের কারণে হয়েছে সেটাও নিজেকে বোঝাতে হবে। তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখাপড়া, হোমওয়ার্ক, মাঠে খেলাধুলা, Extra Curricular Activities, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ সবকিছুর জন্যে সময় ভাগ করে রাখতে হবে। সেই সব কিছু করার পর যদি কোনো সময় পাওয়া যায় শুধু তাহলেই কম্পিউটার গেম খেলবে বলে ঠিক করে নিতে হবে। ধীরে ধীরে কম্পিউটার গেমে সময় কমিয়ে এনে নিজেকে অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

যারা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্ত হয়ে গেছে তাদের বেলাতেও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে একইভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে নিজেকে বোঝাতে হবে এই ধরনের সাইটে অতিরিক্ত সময় দেওয়া

আসলে এক ধরনের আসক্তি। প্রত্যেকবার যখন সামাজিক যোগাযোগ সাইটে কিছু একটা দেখতে ইচ্ছা করবে তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে সত্যি কি তার প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে নিজেকে নিবৃত্ত করতে হবে। প্রত্যেকবার যোগাযোগ সাইটে ঢুকলে সেখানে কতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে সেটা কোথাও লিখে রাখতে হবে। দিনে কত ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, সপ্তাহে কত ঘণ্টা, মাসে কত ঘণ্টা সেটা হিসাব করে সেই সময়টাতে সত্যিকারের কোনো কাজ করলে কতটুকু কাজ করা যেত সেটা নিজেকে বোঝাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি কমাতে হলে সেখান থেকে যোগাযোগের প্রয়োজন নেই এমন মানুষদের কাটছাট করে সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। অন্য সব কাজ শেষ হওয়ার পর সময় থাকলেই এই সাইটে ঢোকা যাবে– এটি নিজেকে বোঝাতে হবে। পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট-এর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সাইট Deactivate করে ফেলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে অভ্যস্ত করে আসক্তিটুকু কমাতে কমাতে এক সময় পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।

মনে রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সেই মুহূর্তগুলো সত্যিকার কাজে ব্যয় না করে কোনো একটি আসক্তির পেছনে ব্যয় করা খুব বড় অপরাধ!

পাইরেসি

লেখক, শিল্পীসহ সৃজনশীল কর্মীদের তাদের নিজেদের সৃষ্টকর্মকে সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া কপিরাইট আইনের লক্ষ্য। সাধারণভাবে, একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যেকোনো কিছুর 'কপি' বা 'অবিকল প্রতিলিপি' তৈরি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য এমনকি বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। যখনই এরূপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়।

কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, নির্মাতা বা প্রোগ্রামার তাদের কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ওই সফটওয়্যারের প্রতিলিপি করা বা সেটির পরিমার্জন করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়। ফলে, কপি বা নতুন সৃষ্টির আইনগত ভিত্তি আর থাকে না। কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাইরেসি সোজা হলেও বিশ্বব্যাপী পাইরেসির প্রকোপ খুব বেশি একথা বলা যায় না। বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স (BSA) নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছে। সংস্থাটির ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাইরেসিমুক্ত। যেহেতু সফটওয়্যার পাইরেসি খুবই সহজ, তাই এর হিসাব করাটা কঠিনই বটে। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা

কপিরাইট আইন সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সৃষ্টকর্মের ওপর 'মালিকানা' বা স্বত্বাধিকার দেয়। ফলে, কোনো সৃষ্টকর্মের বাণিজ্যিক মূল্য থাকলে সেটি তার স্রষ্টাই পান, অন্যরা নন। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থ প্রয়োজন, সেহেতু কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সফটওয়্যার

নির্মাতা, ওয়েবসাইট ডিজাইনকারী সবারই অর্থের প্রয়োজন। তারা তাদের সৃজনশীল কর্ম সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম, মেধা এবং কখনো কখনো অর্থও বিনিয়োগ করেন। কাজেই, সৃষ্টকর্ম বিক্রি বা বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁকে তার বিনিয়োগের সুফল তুলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকেই। কপিরাইট আইনের আওতায় প্রাপ্ত আইনগত অধিকার তাদের সেই সুবিধাই দেয়।

যদি কোনো শিল্পী বা প্রোগ্রামার দেখতে পান যে, তার দীর্ঘদিনের শ্রম ও মেধার ফসল অন্যরা কোনোরূপ স্বীকৃতি বা বিনিময় মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছাড়া উপভোগ বা ব্যবহার করছে তাহলে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কপিরাইট আইনের কার্যকারিতা সৃজনশীল কর্মীদের এই নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার (Right to Information) আইন প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নামে একটি আইন চালু হয়েছে। এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্থাসমূহকে তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণের যেকোনো বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

এই আইনের ফলে অনেকের পক্ষে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল তথ্যের গোপনীয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত, সে সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রকাশকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। যেমন ধরা যাক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র প্রকাশের জন্য কোনো সংস্থাকে এই আইনের আওতায় বাধ্য করা হলে তা সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। এ কারণে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা তথ্য অধিকার আইন সংরক্ষণ করে। একইভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কৌশলগত, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকল তথ্য গোপন রাখাটা এই আইনের লঙ্ঘন নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যদি কোনো তথ্য প্রকাশ করা হলে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়, তাহলে তা এ আইনের আওতায় প্রকাশযোগ্য নয়।

এই সকল ক্ষেত্রে আইনের ৭ম ধারায় নিম্নোক্ত ২০টি বিষয়কে এই আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে-

এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা-

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

(ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য ;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে। আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

কাজেই দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য পাবার পথ উন্মুক্ত ও সহজ করলেও যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করে।

সাধারণ ট্রাবলশুটিং

ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করবে অথচ কখনো সেটি বিগড়ে যায়নি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেনি এমন অভিজ্ঞতার মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিছু কিছু সমস্যা খুবই সাধারণ আবার কিছু সমস্যা জটিল। সাধারণ সমস্যাগুলো অনেক সময় ব্যবহারকারীরাই ঠিক করে ফেলতে পারে। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারও মাধ্যমে ঠিক করাতে হয়। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। তোমরা যারা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার কর তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ প্রত্যেকটি যন্ত্রের সাথে একটি করে ম্যানুয়াল বা ব্যবহার নির্দেশিকা থাকে। এ নির্দেশিকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর শেষদিকে এক বা দুটি পৃষ্ঠা থাকে যার শিরোনাম হলো ট্রাবলশুটিং। ট্রাবলশুটিং অংশে সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি ও এর সমাধান দেওয়া থাকে।

ট্রাবলশুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। সাধারণত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি সমাধান দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারী তার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান অনুসরণের মাধ্যমে বেশিরভাগক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

মূলত ট্রাবলশুটিং হচ্ছে এমন কিছু যা, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে করতে হয়। অন্য যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ট্রাবলশুটিং একটু বেশিই প্রয়োজন হয়। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এ যন্ত্রগুলো আমরা অনেক বেশি সময় ধরে ব্যবহার করি। তাই আইসিটির ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সাধারণ ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাবলশুটিং কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে কিছু ট্রাবলশুটিং নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১.	সিস্টেম চালু হচ্ছে না	১. মেইন পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগটি loose বা ঢিলে কিনা দেখতে হবে। ২. মেইন বোর্ডে পাওয়ার আসছে কিনা দেখতে হবে। ৩. মেইন বোর্ডে যদি পাওয়ার না আসে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পরিবর্তন করতে হবে। ৪. স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখতে হবে।
২.	সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।	১. সিস্টেমটি বন্ধ কর এবং মেইন সিস্টেম থেকে পাওয়ার ক্যাবলটি খুলে ফেলতে হবে (সতর্কতার জন্য)। ২. মেমোরি স্লট থেকে সকল র‍্যাম (RAM) সরিয়ে ফেল। ৩. একটি ইরেজার (Rubber) দিয়ে র‍্যাম-এর কানেক্টরগুলোকে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। ৪. শক্ত ব্রাশ দিয়ে সবগুলো র‍্যাম স্লটকে পরিষ্কার করতে হবে। ৫. র‍্যাম ইনস্টল না করে কম্পিউটারটি চালু কর এবং কোনো Beep সাউন্ড হয় কিনা খেয়াল করতে হবে। ৬. যদি Beep সাউন্ড শুনতে পাও তবে কম্পিউটার বন্ধ করে র‍্যাম ইনস্টল করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৭. যদি কোনো Beep সাউন্ড হয় তবে বুঝতে হবে র‍্যামটি সমস্যাযুক্ত। ৮. এবারও Display না আসলে নতুন র‍্যাম লাগাতে হবে। ৯. র‍্যামকে প্রতিস্থাপন করে আবার চেক কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে Display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।
৩.	সিস্টেম অত্যন্ত গরম হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।	১. কেসিং টি খোল। ২. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে CPU তথা প্রসেসর ফ্যানটি সরাতে হবে। কিন্তু প্রসেসর সরানো যাবে না। ৩. হয়তো দেখবে ভেতরে বা Heat sink-এ প্রচুর ধুলোবালি জমে আছে, যা বায়ু চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করছে। ফলে CPU ঠান্ডা হতে পারছে না। ৪. Heat sink এবং ফ্যানটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় ইনস্টল কর। এবার কেবিনেটটি বন্ধ করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৫. সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৪.	কোনোরূপ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটারটি কয়েক মিনিট পরপর Shutdown হয়ে যাচ্ছে।	১. সতর্কতার সাথে মাদারবোর্ডটি ভালো করে দেখে নাও। লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটির উপর থেকে খুলে আসছে এরূপ চোখে পড়ে কিনা খেয়াল কর। এক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরকে ভালো করে লাগিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। ২. খুব সতর্কতার সাথে চালু অবস্থায় কম্পিউটারটি খেয়াল কর কোনো IC বা কম্পোন্যান্ট অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে কিনা। তবে সাবধান, বোর্ডটা যেন Shorted না হয়ে যায়। যদি তেমন হয় তবে মেরামতের জন্য তোমার নিকটস্থ সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
৫.	উইন্ডোজ রান করার সময় আটকে বা হ্যাং/Hang হয়ে যায়।	১. আপগ্রেড এন্টিভাইরাস চালিয়ে হার্ডডিস্কে কোনো প্রকার ভাইরাস আছে কিনা চেক করে ক্লিন করে নিতে হবে। ২. হার্ডডিস্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অন্যত্র ব্যাকআপ নিয়ে হার্ডডিস্কের "C" ড্রাইভ ফরম্যাট করে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করানো ভালো।
৬.	পাওয়ার অন করলে Display আসার পর কম্পিউটার Hang হয়ে যায়।	১. **প্রথম ধাপ :** কম্পিউটারের পাওয়ার অফ কর এবং কেসিংয়ের একপার্শ্বে খুলে হার্ডডিস্ক, সিডিরম কিংবা ডিভিডি-এর সাথে সংযুক্ত ডাটা ক্যাবল এবং পাওয়ার ক্যাবলসমূহ সাবধানে খুলে ফেল এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখ। যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে– ২. **দ্বিতীয় ধাপ :** মাদারবোর্ড থেকে RAM, Processor, Power supply connection প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা ক্যাবল কানেকশনের সংযোগস্থলে লুজ আছে কিনা? এরপরও যদি একই সমস্যা থাকে তাহলে– ৩. **তৃতীয় ধাপ :** অন্য একটি ভালো কম্পিউটার থেকে প্রসেসর র‍্যাম, হার্ডডিস্ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এই মাদারবোর্ডে ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তাহলে মাদারবোর্ড বদলিয়ে ফেলতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে। **নোট :** অনেক সময় কেসিংয়ের পিছনে মাদারবোর্ডটির কীবোর্ড এবং মাউস পোর্টের সংযোগ লুজ থাকলেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংযোগ দিতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৭.	কম্পিউটার ঘন ঘন হ্যাং করে বা রিবুট/রিস্টার্ট হয়ে যায়।	১. কম্পিউটারের সিপিইউর উপর সংযুক্ত কুলিং ফ্যানটি না ঘুরলে কিংবা পর্যাপ্ত ঠান্ডা করতে না পারলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে কেসিং খুলে কুলিং ফ্যানটিকে ভালোভাবে চেক করে প্রয়োজনে নতুন কুলিং ফ্যান স্থাপন করে নাও। এছাড়াও কম্পিউটার চলাকালীন তোমার সিপিইউর পিছনে কেসিং-এর ফ্যানটি ঘুরে কিনা তাও চেক করতে হবে। ২. কম্পিউটারে ভাইরাস থাকলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই আপগ্রেড এন্টিভাইরাস দ্বারা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ড্রাইভের প্রতিটি ড্রাইভ ক্লিন করে নিতে হবে। এছাড়া অনেক সময় নতুন সফ্‌টওয়্যার বা প্রোগ্রাম লোড করার কারণেও এটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করে দেখা যেতে পারে।
৮.	কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ বা হাত লাগলে শক্ করে।	১. কম্পিউটারের গায়ে তথা মেটাল অংশে স্পর্শ করলে যদি শক্ করে তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটারটি আর্থিং করা নেই। সেক্ষেত্রে একজন পারদর্শী ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা যথাযথভাবে আর্থিং করিয়ে নিতে হবে।
৯.	কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না। অথবা বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে তা সেভ হয় না।	১. মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) এর ব্যাটারিটি কার্যক্ষমতা হারালে এটি ঘটে। এক্ষেত্রে একটি নতুন অনুরূপ ব্যাটারি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিতে হবে।
১০.	Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found মেসেজ দেখায়।	১. কম্পিউটারের পাওয়ার বন্ধ করে কেসিং খুলে মাদারবোর্ড এবং হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত ডেটা ক্যাবল এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে হার্ডডিস্কে সংযুক্ত পাওয়ার ক্যাবলটির সংযোগস্থলে কোনো লুজ আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করে সঠিকভাবে কানেক্ট করতে হবে। ২. হার্ডডিস্কের পিছনের জাম্পার সেটিং ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ড্রাইভটির জাম্পার সেটিং ঠিক আছে কিনা তা দেখে সঠিকভাবে জাম্পার সেটিং করতে হবে। ৩. কম্পিউটার চালিয়ে বায়োসে প্রবেশ করে হার্ডডিস্ক ড্রাইভটিকে বায়োসের অপশন থেকে অটো কিংবা ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করে কিনা তা দেখ। যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে অন্য একটি ভালো কম্পিউটারে তোমার হার্ডডিস্কটিকে লাগিয়ে দেখ হার্ডডিস্কটি কাজ করে কিনা? যদি কাজ না করে তাহলে নিশ্চিন্তে অন্য একটি হার্ডডিস্ক ক্রয় করে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ফেল। কাজটি অবশ্যই অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১১.	Out of Memory or Not Enough Memory মেসেজ দেখায়।	১. সাধারণত কম্পিউটারের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গিয়ে কিংবা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করে কাজ করতে গেলে এ ধরনের ম্যাসেজ প্রদর্শিত হয়। ২. কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করার মতো পর্যাপ্ত মেমোরি না থাকলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে।
১২.	কীবোর্ড কাজ করছে না	১. কম্পিউটারটি বন্ধ করে কীবোর্ডটি পোর্টের সাথে যথাযথভাবে সংযোগ করা আছে কিনা সে বিষয়টি লক্ষ করতে হবে। ২. যদি সংযোগ না থাকে কিংবা লুজ থাকে তাহলে ভালোভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখতে হবে। ৩. এন্টিভাইরাস দ্বারা ভাইরাস ক্লিন করে দেখতে হবে। ৪. এরপরও যদি কীবোর্ড কাজ না করে তাহলে নতুন কীবোর্ড লাগিয়ে নিতে হবে।
১৩.	মাউস ডিটেক্ট করে না কিংবা মাউস কাজ করে না	১. কম্পিউটারের সাথে মাউসের ক্যাবল সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখ এবং ভালোভাবে লাগিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। ২. পোর্ট পরিবর্তন করে দেখতে হবে। ৩. অন্য একটি ভালো মাউস পোর্টে লাগিয়ে দেখতে হবে। ৪. বায়োসে প্রবেশ করে দেখ মাউস ডিজ্যাবল করা আছে কিনা? যদি থাকে এনাবল করে দিয়ে সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ৫. এরপরও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহালে ভালো একটি মাউস লাগিয়ে নাও। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।
১৪.	মনিটরে কোনো পাওয়ার নেই।	১. পাওয়ার বোতাম (বা সুইচ) চালু আছে কিনা। ২. AC পাওয়ার কর্ডটি মনিটরের পেছনে এবং পাওয়ার আউটলেটে ভালোভাবে সংযুক্ত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।
১৫.	মনিটরের পাওয়ার অন/চালু কিন্তু পর্দায় কোনো ছবি নেই।	১. মনিটরের সাথে সরবরাহকৃত ভিডিও ক্যাবলটি কম্পিউটারের পেছনে মজবুতভাবে লাগানো হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। যদি ভিডিও ক্যাবলের অপর প্রান্তটি স্থায়ীভাবে মনিটরের সাথে যুক্ত না থাকে, তাহলে এটিকে দৃঢ়ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। ২. ব্রাইটনেস (Brightness) এবং কনট্রাস্ট (Contrast) ঠিক করে দেখতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১৬.	প্রিন্টারে প্রিন্ট হচ্ছে না।	১. প্রিন্টারের সাথে পাওয়ার ক্যাবলটি সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ২. প্রিন্টার অন/চালু করা আছে কিনা দেখতে হবে। ৩. কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ৪. প্রিন্টারের ভিতরে কোনো প্রকার কাগজ কিংবা অন্য কোনো কিছু আটকে আছে কিনা তা প্রিন্টার খুলে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ৫. প্রিন্টারের কার্টিজে কালি আছে কিনা তা দেখ অথবা প্রিন্টার থেকে কার্টিজটি খুলে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় কার্টিজটিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দেখতে হবে। ৬. প্রিন্টার চালু করার সাথে সাথে যদি লাল কিংবা ব্লিংকিং হলুদ বাতি জ্বলতে থাকে তাহলে প্রিন্টারের রিসেট বাটনে চাপ দিতে হবে। ৭. যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে নতুন করে প্রিন্টারের সাথে সরবরাহকৃত ড্রাইভার সফ্‌টওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে। ৮. হার্ডওয়্যারে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে হবে।

দলগত কাজ

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও কম্পিউটারে আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা আলোচনা করে সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

১. টেম্পোরারি ফাইল বেশি হলে কী ঘটে?

ক. কম্পিউটার স্লো হয়ে যায় খ. কম্পিউটারের গতি বেড়ে যায়

গ. এন্টিভাইরাস কাজ করে না ঘ. ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায় না

২. সিডি, ডিভিডি বা পেন ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে কোন প্রোগ্রামটি প্রথমে চালু হয়?

ক. Setup খ. Autorun

গ. Read me ঘ. Restart

৩. কোনটি আধুনিক পৃথিবীর সম্পদ?

ক. তথ্য খ. উপাত্ত

গ. কম্পিউটার ঘ. ইন্টারনেট

৪. সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে–

i. হার্ডওয়্যার সেটিকে সাপোর্ট করে কিনা

ii. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি বন্ধ করা হয়েছে কিনা

iii. এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইকরাম সাহেব দেখছেন কয়েকদিন ধরে তার কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আবার চালু হয়। আরও লক্ষ করলেন কম্পিউটারটির কাজের গতিও কমে গেছে। তার মনে পড়লো বন্ধুর পেনড্রাইভ থেকে একটি গান কপি করার পর থেকে এটা শুরু হয়েছে।

৫. কম্পিউটারের এ অবস্থার জন্য কোনটি দায়ী?

ক. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার খ. ভাইরাস সফটওয়্যার

গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার ঘ. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

৬. এর ফলে ইকরাম সাহেবের কম্পিউটারে–

i. অপ্রত্যাশিত কোনো বার্তা প্রদর্শন করতে পারে

ii. রাখা ফাইলগুলোর আকার বেড়ে যেতে পারে

ii. মেমোরি কম দেখাতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. তোমার এক বন্ধু প্রায়ই কম্পিউটারে গেমস খেলে। এতে তার কী কী ক্ষতি হতে পারে? বর্ণনা কর।

৮. 'কম্পিউটারের সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' - উক্তিটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- ডিজিটাল কনটেন্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাঠ্যবিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
- ক্যারিয়ার উন্নয়নে আইসিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারব।

ডিজিটাল কনটেন্ট

কোনো কনটেন্ট যদি ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ করে, প্রকাশিত হয় কিংবা প্রেরিত-গৃহীত হয় তাহলে সেটিই ডিজিটাল কনটেন্ট। তবে সেটি ডিজিটাল বা এনালগ যেকোনো পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট কম্পিউটারের ফাইল আকারে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত হতে পারে। লিখিত তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা ভিডিও ডিজিটাল কনটেন্ট হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর হয়।

ডিজিটাল কনটেন্ট-এর প্রকারভেদ

ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত যেকোনো তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা সবই ডিজিটাল কনটেন্ট। কাজেই নানাভাবে ডিজিটাল কনটেন্টকে শ্রেণিকরণ করা যায়। তবে, ডিজিটাল কনটেন্টকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট
- ছবি
- শব্দ বা অডিও এবং
- ভিডিও ও এনিমেশন।

টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট : ডিজিটাল মাধ্যমে এখনো লিখিত তথ্যের পরিমাণই বেশি। সব ধরনের লিখিত তথ্য এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্য রয়েছে নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র ইত্যাদি।

ছবি : সব ধরনের ছবি, ক্যামেরায় তোলা বা হাতে আঁকা বা কম্পিউটারে সৃষ্ট সকল ধরনের ছবি এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্যে রয়েছে ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, এনিমেটেড ছবি ইত্যাদি।

শব্দ বা অডিও : শব্দ বা অডিও আকারের সকল কনটেন্ট এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো বিষয়ের অডিও ফাইলই অডিও কনটেন্ট-এর পাশাপাশি ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট অডিও কনটেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

ভিডিও ও এনিমেশন : বর্তমানে মোবাইল ফোনেও ভিডিও ব্যবস্থা থাকায় ভিডিও কনটেন্টের পরিমাণ বাড়ছে। ইউটিউব বা এই ধরনের ভিডিও শেয়ারিং সাইটের কারণে ইন্টারনেটে ভিডিও কনটেন্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেটে কোনো ঘটনার ভিডিও সরাসরি প্রচারিত হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় ভিডিও স্ট্রিমিং। এমন কনটেন্টও ভিডিও কনটেন্টের আওতাভুক্ত।

ই-বুক

ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক বা ই-বই হলো মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ। যেহেতু, এটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে কারণে এতে শব্দ, অ্যানিমেশন ইত্যাদিও জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য এখন অনেক ই-বুক কেবল ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মুদ্রিত রূপ থাকে না। ফলে অনেকেই এখন আর ই-বুককে মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক সংস্করণ বলতে নারাজ। এ ধরনের বই কেবল কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা বিশেষ ধরনের রিডার (ই-বুক রিডার) ব্যবহার করে পড়া যায়। প্রচলিত রিডারের মধ্যে অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com) কিন্ডল (kindle) সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ই-বুক ব্যবহারের সুবিধা

- ই-বুক ডাউনলোডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব।
- ব্যবহারিকভাবে ই-বুক সংরক্ষণের জন্য কোন লাইব্রেরি বা কক্ষের প্রয়োজন নেই, কম্পিউটার বা রিডিং ডিভাইসে ই-বুক সহজে সংরক্ষণ করা যায়।
- ই-বুক সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
- ই-বুকে তথ্য অনুসন্ধান সহজতর।
- ই-বুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বলে কোন ধরনের শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই।
- ই-বুক সহজে বিতরণ ও বিক্রয়যোগ্য।
- ই-বুক মুদ্রণযোগ্য বলে চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করা সম্ভব, ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়।

বিভিন্ন প্রকার ই-বুক

বর্তমানে ই-বুকের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-বুক রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে ই-বুককে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি। এই ধরনের ই-বুকগুলো মূলত মুদ্রিত বইয়ের মতই হয়ে থাকে। সচরাচর এগুলো পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বই একসঙ্গে অথবা অধ্যায় হিসাবে পাওয়া যায়।
- যে ই-বুকগুলো কেবল অনলাইনে তথা ইন্টারনেটে পড়া যায়, এগুলো সচরাচর এইচটিএমএল-এ প্রকাশিত হয়। এগুলোকে বই-এর ওয়েবসাইট বলা যায়।
- মুদ্রিত বই-এর মতো কিন্তু কিছুটা বাড়তি সুবিধাসহ ই-বুক। এগুলো বই-এর কনটেন্ট ছাড়াও পাঠকের নিজের নোট লেখা, শব্দের অর্থ জানা ইত্যাদি সুবিধা থাকে। এগুলোর বেশিরভাগই ই-পাব (EPUB) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়। এসব ই-বুকের কোনো কোনোটি কেবল বিশেষ ডিভাইসে পড়া যায়। যেমন কিণ্ডল বা আইবুক রিডারে পড়ার উপযোগী ই-বুক। তবে, আইবুকের ক্ষেত্রে নিজস্ব ফরম্যাট রয়েছে।
- চৌকস ই-বুক। এই বইগুলোতে লিখিত অংশ ছাড়াও অডিও/ভিডিও/এনিমেশন ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। এই বইগুলোকে স্মার্ট ই-বুক বলা হয়। এগুলোর কনটেন্ট মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। যেমন এতে কুইজ থাকে। কুইজের উত্তর করার ব্যবস্থাও থাকে এবং উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা তাও ই-বুক থেকেই জানা যায়। এমনকি এসব ই-বুকে ত্রিমাত্রিক ছবিও যুক্ত থাকে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে এর উৎপাদনকারী বা নির্মাতারা এ সকল ই-বুক এমন ফরম্যাটে তৈরি করেন যা কেবল নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারে চলে। যেমন ওপেন কম্পিউটার্সের তৈরি আইবুক কেবল আইপ্যাড বা ম্যাক কম্পিউটারে ভালোভাবে পড়া যায়।
- ই-বুকের অ্যাপস। এক্ষেত্রে ই-বুকটি নিজেই একটি অ্যাপস আকারে প্রকাশিত হয়। অ্যাপস ডাউনলোড করে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে পড়া যায়। মুদ্রিত বই-এর মতো ই-বুকও কপিরাইটের আওতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

শিক্ষায় ইন্টারনেট

আমরা ই-লার্নিংয়ের বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে জেনেছি রেডিও, টেলিভিশন, সিডিরম, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট-ইত্যাদি নানা রকম মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারনেটের ভূমিকা আলোচনা করব, যার অনেক কিছুই ইতোমধ্যে তোমাদের জানা হয়ে গেছে।

তোমরা সবাই এখন ইন্টারনেট শব্দটির সাথে পরিচিত, অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছ। এ প্রযুক্তিটি সারা পৃথিবীতে খুব বড় একটি পরিবর্তন এনেছে। এ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করার জন্যে আমাদের কিছু অবকাঠামো এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে প্রথমে একটি কম্পিউটার কিংবা স্মার্ট ডিভাইস দরকার। ইদানীং মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তিতে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং মানুষের ক্রয়সীমার ভেতরেই 'স্মার্টফোন' বলে বিবেচিত টেলিফোন চলে এসেছে। স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়। যেহেতু এগুলো টেলিফোন, তাই এর স্ক্রিন ছোট তাই শিক্ষার জন্যে এটি ব্যবহার করা একটু কঠিন। তবে আশার কথাহচ্ছে যে, ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মাঝামাঝি একটি সম্ভাবনা রয়েছে যেটি ট্যাবলেট নামে পরিচিত এবং সেটি শিক্ষার কাজে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি অনেক কোম্পানি এই ট্যাবলেটকে মাথায় রেখে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব সেরকম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে শুরু করেছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করার উপযোগী কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন হাতে চলে এলেই আমরা কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করতে পারি না। প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট সংযোগের। দেশের সব জায়গায় সমানভাবে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, তাই সবাই সমানভাবে ইন্টারনেটে স্পিড পায় না এবং ইন্টারনেটের স্পিড কম হলে সেটি ব্যবহার করা অনেক সময়েই অর্থহীন হয়ে যায়। আবার ভালো স্পিডের ইন্টারনেট পেতে হলে যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় সেটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কাজেই শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে এই ইন্টারনেট সংযোগটি অনেক সাশ্রয়ী খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্ভব হলে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি এই দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর ল্যাপটপ কিংবা ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে এবং দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইডথের (Bandwidth) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে তাহলেই কিন্তু পুরোটা শেষ হয়ে যাবে না। এরপরের প্রশ্ন ইন্টারনেটে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কী ব্যবহার করবে? তাদের উপযোগী Contents কী রয়েছে? সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষায় সেগুলো এখনো সেভাবে নেই। সেগুলো সরকারি উদ্যোগে কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আমরা খুব দ্রুত সেগুলো ইন্টারনেটে পেতে শুরু করব বলে আশা করছি।

এ মুহূর্তে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী পড়ালেখা করতে করতে কোনো একটা বিষয় বুঝতে না পারলে সে যদি ইন্টারনেটে সেটি অনুসন্ধান করে– মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় সে তার উত্তরটি কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যাবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় শিখতে চায় কিংবা জানতে চায় সে ইন্টারনেটে তা খুঁজে বের করে নিতে পারবে– এজন্যে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষ সার্চ ইঞ্জিনও আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদগণ তৈরি করেছেন। তবে এ সার্চ ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

গণিতের অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে যেখানে গণিতের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে-কলমে দেখার জন্যেও সাইট রয়েছে। উৎসাহী মানুষেরা নানা বিষয়ে গ্রুপ তৈরি করে রেখেছেন, তাদের কাছে যেকোনো প্রশ্ন দেওয়া হলে তারা উত্তর দিতে পারেন। বাংলায় শিক্ষা দেয়ার জন্যেও ইন্টারনেটে অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে।

ইন্টারনেটে শিক্ষার একটা বিশাল জগৎ বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা প্রমাণিত ভবিষ্যতে শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেট ও আমার পাঠ্য বিষয়গুলো

একজন শিক্ষক আসলে একটা আলোক শিখার মতো। তিনি অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেন, সেই আলোতে চারদিক আলোকিত হয়। শিক্ষার্থীরা সেই আলোতে সব কিছু দেখতে পায় এবং নিজেদের যেটুকু প্রয়োজন কিংবা যেটুকু শিখতে চায় সেটুকু শিখে নেয়। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকও আসলে কাউকে কিছু শেখাতে পারেন না– তারা শুধু সাহায্য করেন, শিক্ষার্থীকে নিজেরই সব কিছু শিখতে হয়।

শিক্ষার সাথে ইন্টারনেট শব্দটি জুড়ে দিয়েও একটি ব্যাপার মনে করিয়ে দিতে হবে, কেউ যেন মনে না করে ভালো ইন্টারনেট সংযোগ কিংবা ইন্টারনেটে খুব ভালো Content থাকলেই রাতারাতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় খুব ভালো হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগটা দিয়ে নতুন একটি জগৎ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে মাত্র, সেই জগৎ থেকে কতটুকু গ্রহণ করবে সেটা পুরোপুরি একজন শিক্ষার্থীর ব্যাপার। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমাদের পরিচিত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে শুধু কম্পিউটার গেম খেলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে সময় নষ্ট করছে। আবার সেই সুযোগ গ্রহণ করে অন্য কেউ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখছে।

তোমরা জানো ইন্টারনেটে তোমাদের সকল পাঠ্যবইগুলো পাওয়া যায়। বছরের শুরুতে তোমাদের হাতে পাঠ্যবইগুলো পৌঁছে যায়। কোনো কারণে সেই বই যদি কেউ হারিয়ে ফেল, কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তোমরা কিন্তু তখন ইচ্ছে করলে ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তোমরা শুনে খুশি হবে বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী মানুষেরা মিলে এই বইগুলোর সফ্‌ট কপি তৈরি করে সেগুলোতে কণ্ঠ দিয়ে বইগুলো সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও এই বইগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে।

> **কাজ**
>
> তোমরা কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে উপকৃত হতে পার? ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে এ বিষয়ে অনধিক ১০০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে তোমাদের জন্যে সবগুলো বই প্রকাশ করা হয় এবং বিনামূল্যে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তার বাইরেও তোমাদের লেখাপড়ার কাজে লাগতে পারে এরকম অনেক বই লেখা হয়। (এখানে কিন্তু মোটেও গাইড বইয়ের কথা বলা হচ্ছে না– সেগুলো কখনোই কাউকে শিখতে সাহায্য করে না।) যারা সেই বই লেখেন তাদের অনেকেই এ বইগুলো তোমাদের ব্যবহারের জন্যে ইন্টারনেটে দিয়ে দেন। বাজার থেকে টাকা দিয়ে বই না কিনে যেকেউ এ বইগুলো ইন্টারনেট থেকে সরাসরি নামিয়ে নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক লেখকই আজকাল তাদের বইগুলো ইন্টারনেটে সবার জন্যে

২০২১

উন্মুক্ত করে দিতে শুরু করেছেন। তোমরা একটু খোঁজ করলেই তোমার পছন্দের অনেক বই একেবারে বিনামূল্যে ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে। তবে তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন তুমি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে কারো রাখা বই বেআইনিভাবে নামিয়ে না ফেলো।

আমরা সবাই জানি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যেটুকু থাকে সেটুকুতে ছাত্রছাত্রীরা সন্তুষ্ট থাকে না, তারা আরো বেশি জানতে চায়। সেজন্যে সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শখের বিষয় বিজ্ঞান, গণিত কিংবা সাহিত্যের ক্লাব তৈরি করে। এক সময় এধরনের ক্লাবে শুধু শারীরিকভাবে উপস্থিত ছেলেমেয়েরাই অংশ নিতে পারত। ইন্টারনেট হওয়ার কারণে বিষয়টা এখন পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন সারা দেশের এমনকি সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এই ক্লাবগুলোতে অংশ নিতে পারে। তারা সবাই মিলে পাঠজগতের বিষয়গুলোকে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশেও এখন বিভিন্ন বিষয়ের অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হচ্ছে এবং তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছো।

আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার ও আইসিটি

একবিংশ শতাব্দিতে আইসিটিবিহীন একটি দিনও কল্পনা করা সম্ভব নয়। আইসিটির সর্বমুখী ব্যবহারের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে যোগ দেওয়া কিংবা নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি উভয় ক্ষেত্রে আইসিটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না।

নিজের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তাই আইসিটিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিজেকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। সাধারণ অফিস সফটওয়্যারের ব্যবহার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসহ প্রায় সব কিছুতেই প্রাথমিক দক্ষতা না থাকলে আগামীতে কোথাও চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। অন্যদিকে প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট বিনির্মাণ, কম্পিউটার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিশেষায়িত কাজের চাহিদাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্যারিয়ার গঠনের একটি বড় ক্ষেত্র। তথ্য প্রযুক্তির প্রধান উপকরণটি বলা চলে কম্পিউটার। এ কম্পিউটারে যে কতশত কাজ আছে তা কল্পনাতীত। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল, কল সেন্টার ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, অফিস অটোমেশন সিস্টেম ডিজাইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মোবাইল কমিউনিকেশন, ডেটা কমিউনিকেশন এমন হাজারটি ক্যারিয়ারের নাম বলা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রোগ্রামিংয়ে সম্ভাবনার দ্বার দিন দিন উন্মোচিত হচ্ছে। প্রোগ্রামিংয়ের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেশি। সবকিছুই এখন কম্পিউটারাইজড হচ্ছে, বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়েই এ প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। স্মার্টফোনের বিভিন্ন অ্যাপস প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমেই করা। প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় অফিসে বসেই ঘরের টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে মানুষের রোগ নির্ণয় করা যাবে। দিন দিন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের আকৃতি ছোট হয়ে আসছে এবং এদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আরও বৃদ্ধি পাবে। রান্না থেকে স্যাটেলাইট পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই মানুষের হাতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। এর সব কিছুই পরিচালিত হবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে।

বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে আমাদের দেশের ভালো প্রোগ্রামাররা দেশে বসেই গুগল, মাইক্রোসফট, ইনটেল, ফেসবুকের মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলোর কাজ করতে পারছেন। তাছাড়া ভালো প্রোগ্রামাররা ইচ্ছা করলে নিজেরাই সফটওয়ার ফার্ম খুলতে পারেন।

পেশা হিসেবে প্রোগ্রামিংয়ের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে। কারণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করার অনেক সুযোগ এখানে রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সরাসরি বিশ্বের নামকরা অনেক সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যেমন মাইক্রোসফট, গুগল, ফেসবুক কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে অনেকেই নিজের মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্ত অবস্থান করে নিচ্ছে এই সব বিখ্যাত কোম্পানিতে। আর একটি মজার ব্যাপার হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব বড় কোম্পানিতে আবেদন করার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো ভালো প্রোগ্রামারকে খুঁজে বের করে নেয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কাজ করার রয়েছে আরও সুবিধা। এতে কোন অফিসে না গিয়েই কাজ করার সুযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর ভালো ভালো কোম্পানি তাদের নিজেদের দেশের কর্মীদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের কর্মীদের কাজ করার সুযোগ দেয়। আমাদের দেশের কর্মীরা বিশ্বমানের। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রোগ্রামারসহ অনেক আইসিটি কর্মী ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ করছে আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেনের মতো দেশগুলোর বড় বড় কোম্পানিতে।

ফ্রিল্যান্সের কাজ করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষায় ভালো দক্ষতা থাকলেই চলে। এছাড়াও আইসিটিতে রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এ কাজ করার সুযোগ। যেসব কোম্পানি নিজেরা সার্ভার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়। তাই চাকরির বাজারে এর অবস্থানও অনেক ভালো। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে বেশ কিছু সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন সফটওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করছে। এটি আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেক শিক্ষার্থী এই পেশার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই সেক্টরে আরও অনেক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে। কাজেই ক্যারিয়ার হিসেবে আইসিটির সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল। এসব বিবেচনা করে নিজের আইসিটি দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে এখন থেকেই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১. ওয়েব সাইটে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই কোনটির প্রয়োজন?

ক. ডেস্কটপ পিসি খ. ট্যাবলেট পিসি

গ. স্মার্টফোন ঘ. ইন্টারনেট সংযোগ

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি?

ক. কম্পিউটার খ. টেলিভিশন

গ. ইন্টারনেট ঘ. স্মার্টফোন

৩. ডিজিটাল কনটেন্ট হলো–

i. ই-বুক, ব্লগপোস্ট ও ই নিবন্ধ

ii. ইনফো গ্রাফিকস ও এ্যানিমেটেড ছবি

iii. অডিও ও ভিডিও স্ট্রিমিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের লেখাটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিনি ও রনির বাবা তাদের জন্য একটি ট্যাবলেট পিসি কিনে দিলেন। রিনি নবম শ্রেণিতে ও রনি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে।

৪. রিনি ও রনির ট্যাবলেট পিসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার হবে-

ক. গেমস খেলায় খ. গান শোনায়

গ. হিসাব নিকাশে ঘ. লেখাপড়ার কাজে

৫. রিনি ও রনির জন্য ট্যাবলেট পিসিটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে-

i. দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন

ii. কমখরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে

ii. ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়াতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. আইসিটি কীভাবে আমাদের ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

৭. 'বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া লেখাপড়া করা কঠিন'- যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়

আমার লেখালেখি ও হিসাব

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- ওয়ার্ড প্রসেসরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে সম্পাদনা করতে পারব;
- স্প্রেডশিট ব্যবহার করে হিসাব-নিকাশ করতে পারব।

ওয়ার্ড প্রসেসরে আমার লেখার কাজ

মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার একটা মাধ্যম হলো লেখালেখি করা। আমাদের প্রয়োজনে আমাদেরকে নানারকমের লেখালেখি করতে হয়। হতে পারে সেটা কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা দিনপঞ্জি লেখা। লেখালেখি ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকমের ছোট-বড় হিসাব করতে হয়। বাজারের হিসাব, বাসাভাড়ার হিসাব, পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ইত্যাদি। আমাদের লেখালেখি ও হিসাবের এ কাজগুলো করা এক সময় কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে এ কাজগুলো করার জন্য এখন আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে অনেক ধরনের সফটওয়্যার। এসব সফটওয়্যারকে বলা হয় অফিস সফটওয়্যার। আমাদের ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা যায়। লেখালেখির জন্য রয়েছে ওয়ার্ড প্রসেসর আর হিসাবের জন্য রয়েছে স্প্রেডশিট এনালাইসিস সফটওয়্যার। এগুলো সম্পর্কে তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছ। এ শ্রেণিতে তোমরা এগুলো সম্পর্কে কিছু অগ্রসর ধারণা পাবে।

কোনোকিছু লেখার কাজ হলো কল্পনার জগৎকে বাস্তবে নিয়ে আসা। মানুষ তার কল্পনাকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে মাধ্যম হিসেবে লেখার কাজ শুরু করে। এ ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি। বর্তমানে এ কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর গুরুত্ব অনেক। টেলিভিশন, মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রে তথ্য গ্রহণ ও উপস্থাপনের জন্য বেশিরভাগ সময় লিখিত কোনোকিছুর প্রয়োজন হয়। আগে যেভাবেই করা হোক না কেন এখন এ কাজটি করা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসরের সাহায্যে। ওয়ার্ড প্রসেসরে কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সুবিধা পেয়ে থাকি। যেমন:

- নির্ভুলভাবে লেখালেখির কাজ করা যায় এবং ভুল হলে সাথে সাথে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।
- সম্পাদনার সুযোগ থাকায় লেখার কাজ নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- নানাভাবে লেখাকে উপস্থাপন করা যায়। যেমন- লেখার আকার ছোট-বড় করা, রঙিন করা, বক্স আকারে উপস্থাপন করা ইত্যাদি।
- পুরো লেখা প্রথম থেকে শুরু না করে নতুন লেখা প্রবেশ করানো, লেখা মুছে ফেলা বা লেখাকে পুনর্বিন্যাস করার সুযোগ পাওয়া যায়।
- ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট ইত্যাদি সংযোজন করে ডকুমেন্টকে আরো আকর্ষণীয় করা যায়।
- ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে তা যেকোনো সময় ব্যবহার করা যায়। ফলে একই কাজ বারবার করার প্রয়োজন হয় না।
- প্রয়োজনবোধে দরকারি তথ্য এক ডকুমেন্ট হতে অন্য ডকুমেন্টে কপি করা যায়।
- একই সাথে একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করা যায়।
- ফাইন্ড-রিপ্লেস কমান্ড ব্যবহার করে বড় কোনো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা যায় এবং প্রতিস্থাপন করা যায়।
- যখন কোনো ডকুমেন্ট বারবার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সেটিকে টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করে রাখা যায় যাতে সময় সাশ্রয় হয়। যেমন- প্রতি সপ্তাহে ল্যাব রিপোর্ট প্রস্তুত করার প্রয়োজন হলে সেটি টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করে রাখলে তা বারবার ব্যবহার করা যায়।
- বড় আকারের ডকুমেন্টে যেমন গবেষণাপত্রে বিষয়বস্তুর সারণি, রেফারেন্স, ছবির তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি অনেক কাজ খুবই স্বল্প সময়ে সম্পাদন করা যায়।

- বানান দেখার সফটওয়্যার বা স্পেল চেকার-এর সাহায্যে সহজেই বানান সংশোধন করা যায়; স্বয়ংক্রিয়ভাবে বানান সংশোধনের ব্যবস্থাও ওয়ার্ড প্রসেসরে রয়েছে।
- ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে তা যেকোনো সময়, যতবার ইচ্ছা ততবার প্রিন্ট করার সুবিধা রয়েছে।
- ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যায়।
- কাগজের নথি বা ফাইলের পরিবর্তে ওয়ার্ড প্রসেসরে তৈরি ফাইল খুব সহজেই সংরক্ষণ করা যায়।
- ফাইলের ব্যবস্থাপনা সহজ যা আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনায় অপরিহার্য, ইত্যাদি।

এছাড়াও ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারগুলোতে আরও নানা সুবিধা রয়েছে। আমরা এগুলো ব্যবহার করার সময় অনেক কিছু জানতে পারব। এতসব সুবিধার কারণে প্রতিদিন এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট সৃষ্টি এবং পুরানো ডকুমেন্ট খোলার কৌশল শিখেছ। আরো শিখেছ কীভাবে এ সকল ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করতে হয়। এবার আমরা ওয়ার্ড প্রসেসরের আরো কিছু কৌশল শিখব। কিন্তু এজন্য তোমাদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে।

আমরা জানি মাইক্রোসফট অফিস হলো পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের অফিস সফটওয়্যার রয়েছে। যার যেকোন একটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। বর্তমানে অনেকেই এগুলোর সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করছে। তবে যেকোন একটি সংস্করণে অভিজ্ঞ হলে অন্যটি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশে যেহেতু মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারটি বেশি ব্যবহৃত হয় তাই এখানে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং মাইক্রোসফট এক্সেল এর ভিত্তিতে আলোচনা করব।

অফিস বাটন এবং এর অপশনসমূহ

ওয়ার্ড ২০০৭ চালু করার পরে একটি উইন্ডো খুলবে। এ উইন্ডোর উপরের বাম দিকের কোনায় আইকনটি হলো অফিস বাটন। এ বাটনটি ক্লিক করলে যে অপশনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো চিত্রে দেখানো হলো।
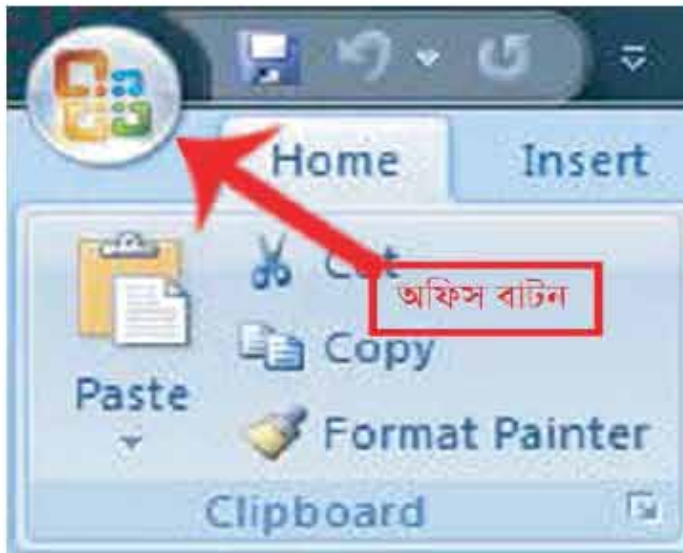
এ অপশনগুলোর মধ্যে বেশি প্রয়োজনীয়গুলো হলো–

নিউ: নতুন ডকুমেন্ট খুলতে এটা ক্লিক করতে হয়।

ওপেন: পূর্বে সংরক্ষণ করা কোনো ডকুমেন্ট খুলতে এটা ক্লিক করতে হয়।

সেইভ: ডকুমেন্টকে সংরক্ষণ করতে এখানে ক্লিক করতে হয়।

সেইভ এজ: একই ডকুমেন্টকে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে এখানে ক্লিক করতে হয়। এর মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করে তার ওপর কাজ করা যায়।

ক্লোজ: খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করার জন্য এখানে ক্লিক করতে হয়।

লেখালেখির সাজসজ্জা : ফন্ট স্টাইল নির্বাচন এবং এর সাইজ ও রঙ নির্ধারণ

তোমরা ইতোমধ্যে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে লেখালেখি করতে শিখে গেছো। এ লেখাগুলোকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় এ কাজটিকে "ফরমেটিং টেক্সট" বলা হয়।

ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখি করার জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষর রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ফন্ট। লেখালেখির সাজসজ্জায় প্রথমেই দেখতে হয় লেখাটি কোন ধরনের ফন্টে হবে। ফন্ট নির্বাচনের কাজটি করতে হয় হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপের ফন্টের নামের ড্রপ–ডাউন বক্স থেকে। এখানে অসংখ্য ফন্টের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমতো একটা ফন্ট বেছে নাও। অনেক সময় লেখার মাঝখানে ভিন্ন স্টাইলের ও সাইজের ফন্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লেখাটিকে নির্বাচন করে ফন্ট গ্রুপের ফন্ট নামের ড্রপ–ডাউন বক্স থেকে ফন্ট নির্বাচন করে দিলে লেখাটি ঐ ফন্টে হবে। ফন্ট সাইজ নির্ধারণ করার জন্য ফন্ট নামের পাশে লেখা সংখ্যার ড্রপ–ডাউন বক্সে ক্লিক করে ইঙ্গিত সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে। তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতো ফন্টের রঙ নির্ধারণ করতে পার। এজন্য ফন্ট গ্রুপের আইকনের ড্রপ–ডাউন বক্সে ক্লিক করে ফন্টের রঙ নির্বাচন করতে হবে।

হোম ট্যাবের ফন্ট গ্রুপে ফন্ট বিষয়ক আরো অনেক সুবিধা আছে। তোমরা সেগুলো ব্যবহার করে দেখতে পারো।

কাজ

তোমার যেকোনো একটি পাঠ্যবই থেকে একটি প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড প্রসেসরে লিখে বিভিন্ন ফন্ট স্টাইল, সাইজ ও রঙের ব্যবহার কর এবং ডকুমেন্টটি একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ কর।

লেখালেখির সাজসজ্জা

বুলেট, নম্বর এবং লাইনের ব্যবধান

আমাদের ফল
- আম
- জাম
- লিচু
- কাঁঠাল
- নারকেল

আমাদের নদী
১. পদ্মা
২. মেঘনা
৩. যমুনা
৪. সুরমা
৫. ভৈরব
৬. তিস্তা

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকমের তালিকা করে থাকি। এসব তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখার জন্য কোনো চিহ্ন, বর্ণ বা সংখ্যা ব্যবহার করে থাকি। এগুলোকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় বুলেট ও নম্বর বলা হয়।
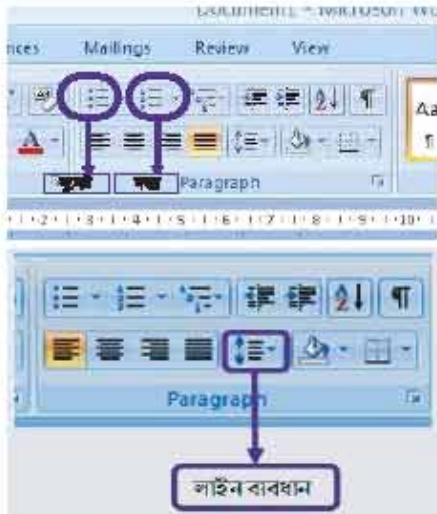
হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়।

লাইনের ব্যবধান: দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ধারণ করার জন্য টুলটি ব্যবহৃত হয়।

> **কাজ**
>
> বুলেট ও নম্বর ব্যবহার করে তোমার পছন্দের কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লিখ।

লেখালেখির সাজসজ্জা: টেবিল ও বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন

ডকুমেন্টে কোনো টেবিল, ছবি, ক্লিপ আর্ট, বিভিন্ন আকার-আকৃতি, চার্ট টেক্সট বক্স, ওয়ার্ড আর্ট যোগ করতে রিবনের ইনসার্ট ট্যাব ব্যবহার করতে হয়।

টেবিল বা সারণি যোগ করা
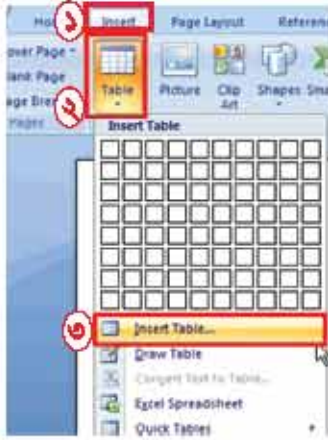
টেবিল বা সারণি যোগ করার জন্য ওয়ার্ড ২০০৭ এর রিবনের (১) ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করে (২) টেবিলে ক্লিক করতে হবে। তারপরে (৩) ইনসার্ট টেবিল ক্লিক করতে হবে। এরপর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখানে কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা ঠিক করতে হবে।

কাজ
১০ জনের দলে ভাগ হয়ে সকলের নাম, পিতার নাম, বয়স, রোল নম্বর টেবিলে বা সারণিতে উপস্থাপন কর।

ছবি যোগ করা

ডকুমেন্টে ছবি যোগ করে ডকুমেন্টকে অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন এ বইয়ে তোমরা লেখার পাশাপাশি অনেক ছবি দেখতে পাচ্ছো। এগুলো যোগ করার জন্যও তোমাদের ওয়ার্ড ২০০৭-এর রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। তারপরে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে পিকচার আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখানে তোমরা তোমাদের ছবির জায়গা নির্ধারণ করে ছবি নির্দিষ্ট করে দিলে ডকুমেন্টে ছবি যুক্ত হয়ে যাবে। এছাড়া ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ক্লিপআর্ট, শেইপ (আকৃতি), স্মার্ট আর্ট, চার্ট যোগ করার সুবিধা রয়েছে।

কাজ
শিক্ষকের সহায়তায় তোমার তৈরি করা একটি ডকুমেন্টে ছবি যোগ কর।

ওয়ার্ড আর্ট যোগ করা

ইনসার্ট ট্যাব থেকে তোমরা ইচ্ছে করলে বিভিন্ন স্টাইলের লেখা যোগ করতে পার। এজন্য তোমাদের ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপে ওয়ার্ড আর্ট-এ ক্লিক করে তোমাদের পছন্দমতো স্টাইল নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে ডায়ালগ বক্স আসবে তাতে ফন্ট ঠিক করে লেখা দিলে তা কাঙ্ক্ষিত স্টাইলে প্রদর্শন করবে।

মার্জিন ঠিক করা

ডকুমেন্টের লেখার মার্জিন ঠিক করতে হলে রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। তারপরে মার্জিন আইকনে ক্লিক করে মার্জিন ঠিক করে দিতে হবে। মার্জিন আইকনে ক্লিক করলে মার্জিন নির্ধারণের বিভিন্ন অপশন দেখাবে। সেখান থেকে তোমাদের পছন্দমতো মার্জিন নির্ধারণ করে দিতে পার অথবা কাস্টম মার্জিনে ক্লিক করে তোমরা নিজস্ব মার্জিন ব্যবহার করতে পারো।
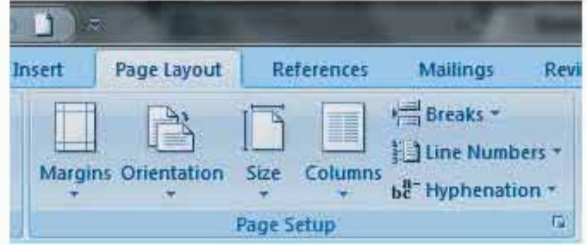
কাজ ১

তোমার বিদ্যালয়ের নাম ওয়ার্ড আর্টের বিভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন কর।

কাজ ২

একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মার্জিন নির্ধারণ কর।

প্যারাগ্রাফের লাইন ব্যবধান নির্ধারণ করা

ডকুমেন্টের প্রত্যেকটি লাইনের মধ্যে কী পরিমাণ ব্যবধান হবে তা নির্ধারণ করতে রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। এখানে প্যারাগ্রাফ গ্রুপে স্পেসিং–এ লাইনের আগে ও পরে কত পয়েন্ট জায়গা থাকবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ডকুমেন্ট টাইপ করার পরেও এ কাজটি করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রথমে ডকুমেন্টের যে অংশের লাইন ব্যবধান ঠিক করতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর উপরের বর্ণনা অনুযায়ী লাইন ব্যবধান ঠিক করে দিতে হবে।

কাজ

তোমার বাংলা অথবা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি অংশ টাইপ করে তার লাইন ব্যবধান নির্ধারণ কর।

পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়া

ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় নম্বর দেওয়া। এ কাজটি করার জন্য রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে হেডার ও ফুটার গ্রুপে পেইজ নাম্বার ক্লিক করে নির্দিষ্ট অপশন বেছে নিতে হবে। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে পৃষ্ঠার নম্বর যোগ করতে পার।

কাজ
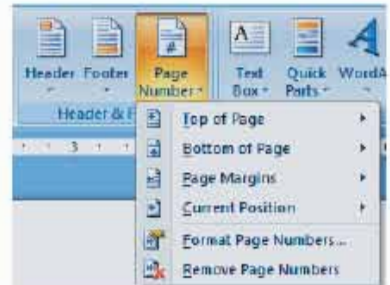
তোমার তৈরিকৃত একটি ডকুমেন্টে পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে সংরক্ষণ কর।

বানান পরীক্ষণ ও সংশোধন

স্পেল চেকিং ডায়ালগ বক্স

ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে বানান পরীক্ষণ। ডকুমেন্টের কোথাও কোন বানান ভুল হলে তা পরীক্ষণ এবং সংশোধন করা যায়। ব্যাকরণও শুদ্ধ করা যায় অনেক ক্ষেত্রে। বানান পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন শব্দ প্রোগ্রামের অভিধানে সংযোজন করা যায়। বানান পরীক্ষণের সময় ভুল শব্দ বের করে সম্ভাব্য কিছু শুদ্ধ শব্দ উপস্থাপন করে, যাতে ব্যবহারকারী সঠিক শব্দটি বেছে নিতে পারে। এসময় অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করে নিতে হয়। তা'না হলে আপাত শুদ্ধ বানান ভুল দেখাতে পারে। যেমন, যদি কোন ওয়ার্ড প্রসেসরের অভিধানে আমেরিকান ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করা থাকে এবং ডকুমেন্ট Colour শব্দটি লেখা হয়, তবে তা ভুল বানান হিসাবে সনাক্ত হবে। কারণ, Colour বানানটি ব্রিটিশ ইংরেজির, আমেরিকান ইংরেজি অনুসারে এটি হবে Color।

এছাড়া বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন বা জায়গার নাম ইত্যাদিকে স্পেলচেকার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব শব্দ ভুল না শুদ্ধ তা ব্যবহারকারীকেই নিশ্চিত করতে হয়।

স্প্রেডশিট ও আমার হিসাব-নিকাশ

স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ সফটওয়্যারের সাথে পরিচিত হয়েছ। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে আছে তো? চলো দেখি স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যগুলো:

স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- বিভিন্ন রকমের সংখ্যা বা অক্ষরভিত্তিক উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায়।
- যেকোনো ধরনের হিসাবের জন্য সুবিধাজনক।
- কলাম ও সারি থাকার কারণে উপাত্ত শ্রেণিকরণ সহজ।
- সূত্র ব্যবহারের সুযোগ থাকায় অনেক বেশি উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায়।
- বিভিন্ন ফাংশন সূত্রাকারে ব্যবহার করে সহজে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায়।
- আকর্ষণীয় গ্রাফ, চার্ট ব্যবহার করে উপাত্ত উপস্থাপন করা যায় ইত্যাদি।
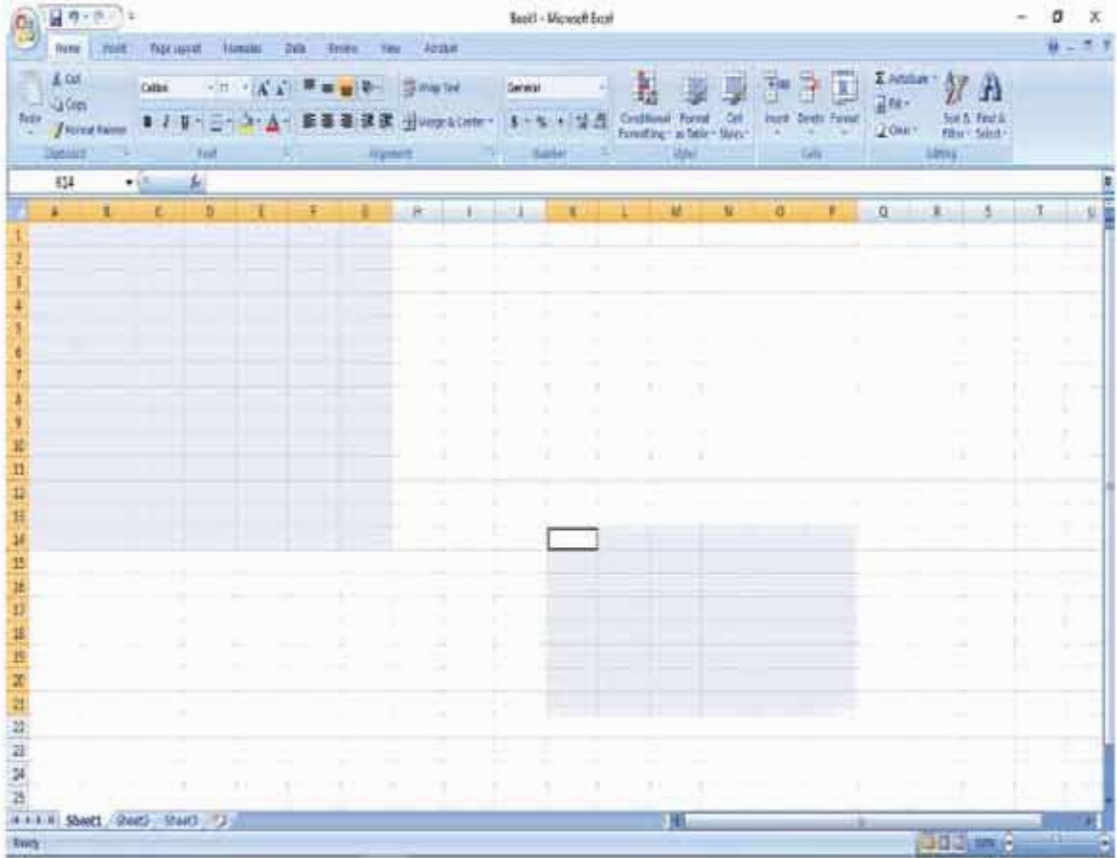
স্প্রেডশিট ব্যবহারের ক্ষেত্র :

স্প্রেডশিট হচ্ছে একধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা তালিকাবদ্ধভাবে ডাটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে স্প্রেডশিটের কতিপয় ব্যবহার উল্লেখ করা হল:

- শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণ,
- আয়-ব্যয় হিসাবে;
- বাজেট তৈরিতে;
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত হিসাবে;
- এয়ারলাইন রিজার্ভেশনে;
- আয়কর হিসাব ও বিশ্লেষণে;
- নির্বাচনের ভোট গণনায়;
- খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়নে।

স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল

তোমরা ইতোমধ্যে স্প্রেডশিট ব্যবহারের কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে শিখেছ। এ বইয়ে তোমরা আরও কিছু অগ্রসর ধারণা শিখতে পারবে।

গুণ করা

স্প্রেডশিটে গুণ করার জন্য ফলাফল সেলের মধ্যে সূত্র দিতে হয়। সূত্র সব সময় "=" সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। গুণ করার প্রক্রিয়া দু'ধরনের।

১. সাধারণভাবে সেলে সূত্র লিখে এন্টার দিলে ফলাফল পাওয়া যায়।

২. ফলাফল সেলে স্প্রেডশিট ফাংশন = PRODUCT লিখে সেলের রেঞ্জ দিয়ে এন্টার দিলে।

D3 =PRODUCT(B3:C3)

	A	B	C	D
1	মাসিক বাজার খরচ			
2	দ্রব্যের নাম	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	খরচ
3	চাল	৪৪	৪০	১৭৬০
4				

ফাংশন ব্যবহার করে গুণ করার সুবিধা হলো এখানে প্রয়োজন হলে অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে সম্পন্ন করা যায়। নিচের চিত্রে তিনটি সেলের গুণ করার প্রক্রিয়া দেখানো হলো:

D3 =PRODUCT(A3:C3)

	A	B	C	D
1	ঘনকের আয়তন			
2	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	আয়তন
3	৪০	১৫	১৪	৮৪০০
4				

> **কাজ**
> একটি স্প্রেডশিট ফাইল খুলে কাল্পনিক কিছু তথ্যের গুণ কর।

ভাগ করা

স্প্রেডশিটে ভাগ করার কাজটিও সূত্র দিয়ে করতে হয়। ভাগ করার ক্ষেত্রে A1 সেলকে B1 সেল দিয়ে ভাগ করার জন্য ফলাফল সেলে = A1/ B1 সূত্র লিখতে হয়। এক্ষেত্রে / চিহ্নটি ভাগ চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কাজ
সূত্রটি ব্যবহার করে তোমরা ফলাফল বের করার চেষ্টা করে দেখ।

শতকরা নির্ণয় করা

৪০০ টাকার ১৫% কত টাকা? ক্রয়মূল্য ১২০০ টাকা হলে ১৬% লাভে বিক্রয়মূল্য কত? বাস্তব জীবনে আমরা এ ধরনের অনেক হিসাবের মুখোমুখি হই। স্প্রেডশিটের মাধ্যমে সহজেই আমরা এ হিসাবগুলো করতে পারি।

স্প্রেডশিটের মাধ্যমে প্রথম সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে ফলাফল সেলে =A3*B3% সূত্র প্রয়োগ করে সমাধান করা যায়। সূত্রটি কীবোর্ড ব্যবহার করে ফলাফল সেলে লিখার নিয়ম হলো প্রথমে = চিহ্ন দিয়ে ৪০০ লিখা সেলে ক্লিক করতে হবে। তারপর কীবোর্ডে * চাপতে হবে। তারপর ১৫ লিখা সেলে ক্লিক করতে হবে। এরপর কীবোর্ড থেকে % (শিফট কী চেপে ৫) লিখে এন্টার করতে হবে। পেয়ে যাবে তোমাদের ফলাফল।

দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধান করার জন্য =A3*B3%+A3 সূত্র ব্যবহার করতে হবে। এ সূত্রটি লিখার নিয়মও উপরের নিয়মের মতো।

কাজ
শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শতকরা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কর।
যেমন মি. চৌধুরীর মাসিক মূলবেতন ১৬৫০০ টাকা। তিনি ৫৫% হারে বাড়িভাড়া ভাতা এবং ৭০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। তাঁর মোট বেতন হতে ৯০ টাকা কল্যাণ তহবিল এবং যৌথবীমা বাবদ চাঁদা প্রদান করেন। তাঁর নিট বেতন কত?

*সফটওয়্যারের সংস্করণ ভিন্নতার কারণে টাইটেল ও মেনু বারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

অনুশীলনী

১. কোনো ডকুমেন্ট টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করা হয় কেন?

ক. নান্দনিকতার জন্য
খ. বারবার ব্যবহারের জন্য
গ. পুনর্বিন্যাস করার জন্য
ঘ. কপি সুবিধার জন্য

২. কোনো ডকুমেন্ট প্রথমবার সংরক্ষণ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. নিউ
খ. ওপেন
গ. সেইভ
ঘ. সেইভ এজ

৩. স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ ব্যবহার করে -

i. লেখালেখি করা সহজ
ii. সূত্র ব্যবহার করা যায়
iii. উপাত্ত বিন্যাস করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৌমিত্র শখের বশে প্রকৃতি নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করেন। মাঝে মাঝে তার লেখার সাথে ফুল, পাখি বা নদীর ছবি দিতে হয়। তিনি পেশাগত জীবনে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। সেখানে তাকে কর্মচারীদের বেতনের হিসাব রাখতে হয় এবং মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়।

৪. সৌমিত্রকে তার শখের কাজে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়?

ক. ওয়ার্ড প্রসেসর
খ. স্প্রেডশিট
গ. গ্রাফিক্স
ঘ. ডাটাবেজ

৫. সৌমিত্রকে তার পেশাগত কাজে –

i. টেমপ্লেট ব্যবহার করতে হয়
ii. সূত্র ব্যবহার করতে হয়
iii. উপাত্ত বিন্যাস করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. তালিকা তৈরি করতে ওয়ার্ড প্রসেসরে কোন ধরনের সাজসজ্জা (ফরমেটিং) ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের ৫টি সুবিধা লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স
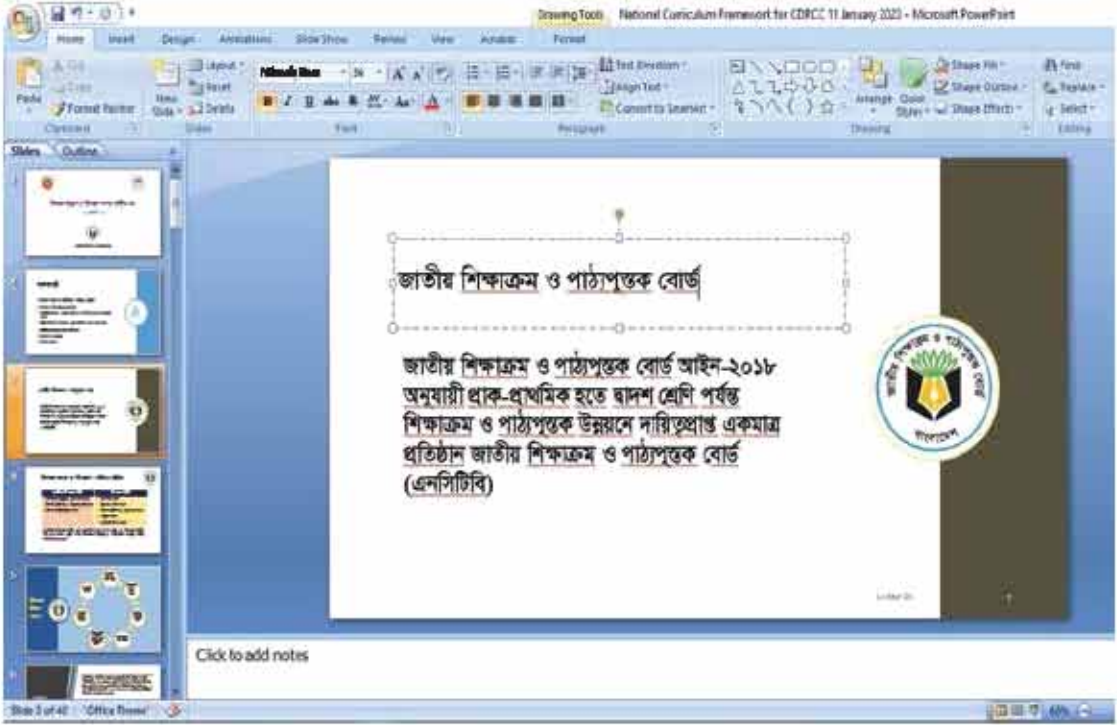
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- গ্রাফিক্স-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিষয় সংশ্লিষ্ট Slide তৈরি ও উপস্থাপন করতে পারব;
- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে সৃজনশীল চিত্র অঙ্কন ও উপস্থাপন করতে পারব।

২০২৩

মাল্টিমিডিয়ার ধারণা

আদিকাল থেকেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করেছে। লেখা একটি প্রকাশ মাধ্যম, শব্দ একটি প্রকাশ মাধ্যম আবার চিত্রও একটি প্রকাশ মাধ্যম। আমরা যখন অনেকগুলো প্রকাশ মাধ্যমকে নিয়ে কথা বলি তখনই মাল্টিমিডিয়া বলে তাকে চিহ্নিত করে থাকি। সভ্যতার বিবর্তন ও প্রযুক্তির কারণে এই মাধ্যমগুলোর বহুবিধ ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশেষ করে আমরা যখন ডিজিটাল যুগে বাস করছি তখন আমাদের প্রকাশ মাধ্যমের ধরন বদলে গেছে।

আমরা এখন অনুভব করি যে, এনালগ যুগের মিডিয়াগুলোই ডিজিটাল যুগের প্রধান প্রকাশ মাধ্যম নয়। বরং এনালগ যুগের পুরানো মিডিয়া এ যুগে ব্যবহৃত হলেও এর ব্যবহারের মাত্রা বদলেছে। এক সময়ে যেসব মিডিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো তা এখন একসাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার সেই সব মিডিয়ায় যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল যন্ত্রের প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। আমরা এখন বহু মিডিয়াকে তার বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং ক্ষমতার জন্য বলছি ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া। এই দুটি শব্দ এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এক কথায় মাল্টিমিডিয়া মানে বহু মাধ্যম। ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া মানে হচ্ছে, সেই বহু মাধ্যম যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে।

মাল্টিমিডিয়া হলো মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়। আমরা অন্তত তিনটি মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রকাশ করি সেগুলো হলো বর্ণ, চিত্র এবং শব্দ (সাউন্ড)। এই মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন রূপও রয়েছে। এই তিনটি মাধ্যম তাদের বিভিন্ন রূপ নিয়ে কখনো আলাদাভাবে, কখনো একসাথে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। এসব মাধ্যমের প্রকাশকে আমরা কাগজের প্রকাশনা, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা, ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েবপেজ ইত্যাদি নানা নামে চিনি। তবে এর সবগুলোকেই বা একাধিক মাধ্যমকেই আমরা আলাদাভাবে মাল্টিমিডিয়া বলব না। কাগজের প্রকাশনা বা রেডিওকে কেউ মাল্টিমিডিয়া বলতে চাইবেন না। বলা ঠিকও হবে না। টেলিভিশন-ভিডিও-সিনেমাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি। আবার ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বা ওয়েব পেজকে আমরা ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি।

মাল্টিমিডিয়া সচরাচর ডিজিটাল যন্ত্রের সহায়তায় ধারণ বা পরিচালনা করা যায়। এটি সরাসরি মঞ্চে প্রদর্শিত হতে পারে বা অন্যরূপে সরাসরি সম্প্রচারিতও হতে পারে। মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু ধারণ ও পরিচালনা করার ইলেকট্রনিক যন্ত্রকেও মাল্টিমিডিয়া নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কোনো একটি কর্মকাণ্ডে তিনটি মাধ্যমকেই একসাথে ব্যবহার করাকে মাল্টিমিডিয়া বলে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ১৮৯৫ সালে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হবার পর তাতে বর্ণ (Text), চিত্র (Graphics), শব্দ (Sound) এবং চলমানতা (Animation) যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমের পরস্পর সংলগ্ন হবার ব্যাপারটি ঘটতে থাকে যা মাল্টিমিডিয়ার একটি রূপ। আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ বলতে তাই সিনেমাকে স্মরণ করতে হবে। তবে প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের যুক্ত হবার সেই সূচনাকালটি অনেক আগের হলেও এসবের সাথে কম্পিউটারের যুক্ত হওয়া খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়।

মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ

আমরা সবাই জানি সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল যন্ত্র কম্পিউটার গণনা যন্ত্র বা হিসাব-নিকাশ করার যন্ত্র হিসেবেই সমধিক পরিচিত হয়ে আসছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগ কম্পিউটারের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এরপর লেখালেখি করার জন্য এই যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।

কিন্তু এতসব কাজ করার জন্য শুরুতে কম্পিউটারের একটি মাত্র মিডিয়া যথা- বর্ণ ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারে চিত্র এবং শব্দ সমন্বিত হয়। তাছাড়া কম্পিউটারের রয়েছে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। বস্তুত কম্পিউটারের মাল্টিমিডিয়া মানে হলো বর্ণ, চিত্র ও শব্দের সমন্বয়ে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অভিজ্ঞতা। অতীতের চাইতে এখনকার মাল্টিমিডিয়ার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ। যন্ত্র হিসেবেও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার কেবল কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ নয় পাশাপাশি আমাদের হাতের কাছের মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্র এখন মাল্টিমিডিয়া ধারণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিমিডিয়ার প্রধান মাধ্যমসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো-

সারা পৃথিবীতে এখন সর্বপ্রথম যে প্রবণতাটি স্পর্শ করছে সেটি হচ্ছে প্রচলিত ধারণা ও প্রচলিত যন্ত্রপাতিকে কম্পিউটার দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা।

১. **বর্ণ বা টেক্সট:** সারা দুনিয়াতেই টেক্সটের যাবতীয় কাজ এখন কম্পিউটারে হয়ে থাকে। একসময় টাইপরাইটার দিয়ে এসব কাজ করা হতো, এখন অফিস-আদালত থেকে পেশাদারি মুদ্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে।

২. **চিত্র বা গ্রাফিক্স:** দুনিয়ার সর্বত্রই গ্রাফিক্স তৈরি, সম্পাদনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করেই করা হয়। আমাদের দেশে গ্রাফিক্স ডিজাইন, পেইন্টিং, ড্রইং বা কমার্শিয়াল গ্রাফিক্স নামক চারুকলার যে অংশটি রয়েছে তাতে কম্পিউটারের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। তবে একটি ব্যতিক্রমী এলাকা হচ্ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা। মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় নব্বই দশকে। প্রথমে ফটোশপ দিয়ে স্ক্যান করা ছবি সম্পাদনা দিয়ে এর সূচনা হয়। ক্রমশ ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সে কম্পিউটার জায়গা করে নিতে থাকে।

৩. **ভিডিও:** ভিডিও কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স। একে চলমান গ্রাফিক্স বললে ভালো হয়। বিশ্বজুড়ে ভিডিও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া। টিভি, হোম ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার, ওয়েব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ভিডিওর ব্যবহার ব্যাপক।

৪. **এনিমেশন:** এনিমেশনও এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র, তবে সেটি চলমান বা স্থির হতে পারে, এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে, আমাদের দেশে এনিমেশনের ব্যবহারও ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। বিশেষত বিজ্ঞাপন চিত্রে এনিমেশন একটি প্রিয় বিষয়, তবে এনিমেশনে কাজ করার লোকের অভাব রয়েছে। আসলে এনিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর সাথে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে।

৫. **শব্দ বা অডিও:** শব্দ বা অডিও রেকর্ড, সম্পাদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সারা দুনিয়া এখন কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এনালগ পদ্ধতি এখন কার্যত সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। কম্পিউটার দিয়ে উন্নতমানের সাউন্ড রেকর্ডিং করা যায়।

৬. **ইন্টারঅ্যাকটিভ কম্পিউটিং:** ইন্টারঅ্যাকটিভিটি সম্পর্কে একটি কথা জানা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি স্টাইল প্রয়োগ করলে যদি অক্ষরগুলো সুন্দর করে স্ক্রল বা ফ্লাস করে বা যদি ভিডিও ফাইলে একটি ইফেক্ট যোগ করা হয় কিংবা এনিমেশন করলে যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয় তাকে ইন্টারঅ্যাকটিভ বলা ঠিক হবে না। ফ্লাশ, ডিরেক্টর বা অথরওয়্যার-এর মতো শক্তিশালী অথরিং সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ব্যবহারকারীর সাথে কম্পিউটারের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব এমন কিছুকেই আমরা ইন্টারঅ্যাকটিভিটি বলব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহের নানান দিক উন্মোচিত হচ্ছে।

১. **শিক্ষার উপকরণ হিসেবে:** শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। শ্রেণিকক্ষগুলো মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হলে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে। শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করতে পারেন। এছাড়া রয়েছে মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যার।

১.১ **মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার:** বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার প্রস্তুত হওয়া কেবল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ-৭১, অবসর, বিশ্বকোষ, নামাজ শিক্ষা, বিজয় শিশু শিক্ষা- এমন কয়েকটি সিডিতে মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে প্রকৃত ইন্টারঅ্যাকটিভিটি এখনো নেই বললেই চলে। অবশ্য আশা করা হচ্ছে একুশ শতকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি হবেই।

১.২ **ডিজিটাল প্রকাশনা:** আমাদের প্রকাশনা এখনো কাগজনির্ভর। তবে একুশ শতক অবশ্যই ডিজিটাল প্রকাশনার শতক হবে বাংলাদেশেও।

২. **বিনোদন :** বিনোদনের অধিকাংশ এলাকায় মাল্টিমিডিয়া জুড়ে রয়েছে। সিনেমা বা নাটকের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করে আরও প্রাণবন্ত করা হচ্ছে।

৩. **বিজ্ঞাপন :** বিজ্ঞাপনে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই দেখানো যাচ্ছে।

৪. **গেমস :** কম্পিউটার গেমস বা ভিডিও গেমগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। গেমসগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা (Reality) ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে।

৫. **এনিমেশন:** এনিমেশন চলমান বা স্থির গ্রাফিক্স বা চিত্র। এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে। বিজ্ঞাপন চিত্রে এনিমেশনের ব্যবহার একটি প্রিয় বিষয়। এনিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অডিও, ভিডিও, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সমন্বয়ে সাধারণত এনিমেশন তৈরি হয়।

যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনিই মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপার। এই কাজটি করার জন্য এডোবি ফটোশপ থেকে থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স বা মায়া ইত্যাদি অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে আমরা তাদেরকেই মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার অথবা মাল্টিমিডিয়া অথর বলবো যারা এসব মিডিয়া ব্যবহার করে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন। বস্তুত কনটেন্টস ডেভেলপ করা ও ইন্টারঅ্যাকটিভিটি যোগ করার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এডোবি প্রিমিয়ার বা এডোবি ফটোশপ এমন সফটওয়্যার, যা দিয়ে একটি চমৎকার কনটেন্টস তৈরি করা যায়। কিন্তু আমরা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম বলবো ডিরেক্টরকে, যার সাহায্যে প্রিমিয়ার বা ফটোশপে তৈরি করা মিডিয়াগুলোকে মিলিয়ে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়।

আগামী দিনগুলোতে মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামারের চাহিদা এবং সংখ্যা কোনোটাই কম হবে না। বিজনেস সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস-এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপ করা ও প্রোগ্রামিং করতে পারা দক্ষ লোকের চাহিদা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার

প্রেজেন্টেশন তৈরি করা

বর্তমান সময় হচ্ছে তথ্য বিনিময় এবং তথ্যের প্রবাহ অবারিত করে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার যুগ। এখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং পেশাজীবীদের মধ্যে তথ্য বিনিময় বা তথ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করছে। সকল প্রকার তথ্যের ভান্ডার সকলের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সভা, সেমিনার–সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সবাই তাঁদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য প্রধানত প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় যেমন পাওয়ার পয়েন্ট, পিকাসা, ইমপ্রেস ইত্যাদি। পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন। এ সফটওয়্যারটিকে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারও বলা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ প্রায় সকলের সুবিধার জন্য মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও, গ্রাফ ইত্যাদির সমন্বয়ে আকর্ষণীয়ভাবে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সভা, সেমিনার–সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটি খুব সহজে এবং চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায়। এ দিক থেকে পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটির বিকল্প নেই বললেই চলে। এজন্যই সভা, সেমিনার–সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে তথ্য উপস্থাপনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। পাওয়ার পয়েন্টে ফাইলকে বলা হয় প্রেজেন্টেশন।

প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে স্লাইড (Slide) বলা হয়। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামে যেমন একটি ফাইলের মধ্যে অনেক পৃষ্ঠা থাকে, তেমনি একটি প্রেজেন্টেশনে একাধিক স্লাইড থাকে। একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে হ্যান্ড আউটস (Handouts) বলা হয়। পরিকল্পিতভাবে একটি পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য খসড়া করে নিতে হয়। এই খসড়াকে বলা হয় Slide Layout।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলা এবং স্লাইড তৈরি করা

পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলার জন্য –

১. পর্দার নিচের দিকে বাম কোণে Start লেখা রয়েছে। এটি হচ্ছে স্টার্ট বোতাম।

২. Start বোতামের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু বা তালিকা আসবে।

৩. এ মেনুর All Programs কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

৪. এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে Microsoft Office মেনুতে ক্লিক করলে পাশেই আর একটি ফ্লাইআউট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস- এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৫. এ তালিকা থেকে Microsoft Office Power Point কমান্ড সিলেক্ট করলে মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট-এর প্রথম স্লাইডের পর্দা উপস্থাপিত হবে। এ পর্দার মূল অংশে-

- বক্সের মধ্যে Click to add title এবং Click to add subtitle লেখা থাকবে। লেখা দুটির উপর ক্লিক করলে টেক্সট বক্স দৃশ্যমান হবে এবং টেক্সট বক্সের মধ্যে ইনসার্শন পয়েন্টার থাকবে। ইনসার্শন পয়েন্টার থাকা অবস্থায় শিরোনাম এবং উপ-শিরোনাম টাইপ করা যাবে। কিছু টাইপ না করে বক্সের বাইরে ক্লিক করলে আবার ওই দুটি লেখা দৃশ্যমান হবে।
- টেক্সট বক্সের বর্ডারে ক্লিক করে সিলেক্ট করার পর ডিলিট বোতামে চাপ দিলে লেখাসহ টেক্সট বক্স বাতিল হয়ে যাবে।
- Home মেনুর রিবন থেকে টেক্সট বক্স আইকন সিলেক্ট করে ইনসার্শন পয়েন্টার পর্দায় ভেতরে নিয়ে এলে পয়েন্টারটি টেক্সট পয়েন্টারের রূপ ধারণ করবে। এ অবস্থায় উপর থেকে নিচের দিকে কোণাকুণি টেনে বক্স তৈরি করতে হবে।
- বক্সের ভেতর ইনসার্শন পয়েন্টার থাকবে।
- বাংলায় টাইপ করার জন্য কীবোর্ডকে বাংলায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে।
- টুল বার ও রিবন থেকে ফন্ট, ফন্টের আকার-আকৃতি, রং ইত্যাদি সিলেক্ট করে টাইপের কাজ করতে হবে।
- সুতন্বীএমজে ফন্ট, সাইজ ১৫০, রঙ নীল সিলেক্ট করে টাইপ করা হলো 'আমাদের দেশ'।
- টাইপ করার পর টেক্সট বক্সটি সিলেক্টেড থাকবে। সিলেক্টেড টেক্সট বক্সের চার বাহুতে চারটি এবং চার কোণে চারটি ছোট গোলাকার ফাঁপা সিলেকশন পয়েন্ট থাকবে। এ সব সিলেকশন পয়েন্ট ড্র্যাগ করে বক্সের আকার ছোট-বড় করা যাবে। লেখা সংকুলানের জন্য বক্সটি পাশাপাশি বা উপর-নিচে ছোট-বড় করা যেতে পারে। বক্সের বাইরে ক্লিক করলে বক্সের সিলেকশন চলে যাবে।

- বক্সের যেকোনো বাহুর যেকোনো স্থানে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে বক্সটি পর্দার যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।
- স্লাইড তৈরির উইন্ডোর বাম পাশে থাম্বনেইল ভিউতে স্লাইডের ছোট সংস্করণ দেখা যাবে।
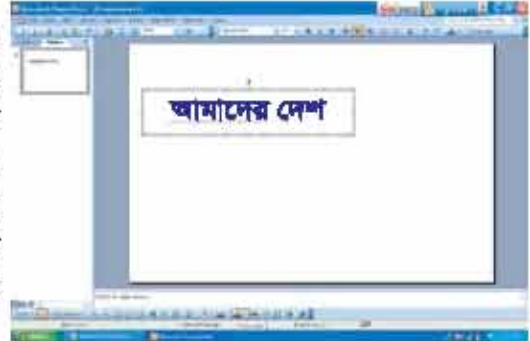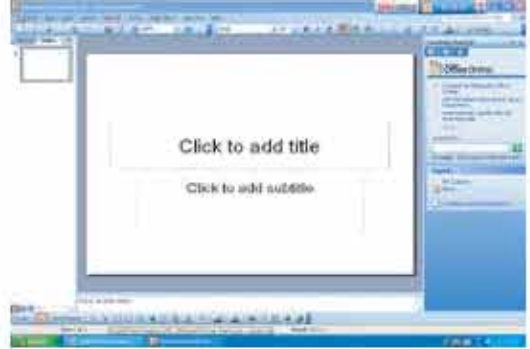
প্রেজেন্টেশন সেভ বা সংরক্ষণ করা

- ফাইল মেনু থেকে Save কমান্ড দিলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।
- Save As ডায়ালগ বক্সের ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, My Country.
- ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে প্রেজেন্টেশনটি My Country নামে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
- অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে My Country নামের প্রেজেন্টেশন ফাইলটি খুলে নিতে হবে।

নতুন স্লাইড যোগ করা

একটি প্রেজেন্টেশনে সাধারণত অনেক স্লাইড থাকতে পারে। নতুন স্লাইড যুক্ত করার জন্য-

১. Home মেনুর রিবন থেকে New Slide কমান্ড সিলেক্ট করলে বা কীবোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে M বোতামে চাপ দিলে একটি নতুন স্লাইড যুক্ত হবে।

- নতুন যুক্ত হওয়া স্লাইডে Click to add title এবং Click to add text লেখা থাকবে। পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে লেখা দুটি ডিলিট করে দিতে হবে বা বাতিল করে দিতে হবে। বাম পাশের থাম্বনেইল উইন্ডোতে নতুন যুক্ত হওয়া স্লাইডের ছোট সংস্করণ দেখা যাবে।

২. পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে একটি টেক্সট বক্সে নতুন স্লাইডের শিরোনাম টাইপ করতে হবে "একুশ থেকে একাত্তর"।

৩. একই নিয়মে তিনটি টেক্সট বক্সে ভিন্ন ভিন্নভাবে টাইপ করতে হবে

১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালের ২৬ এ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এ দিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ দিন মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

- বক্স তিনটি উপর থেকে নিচের দিকে পরস্পর স্থাপন করতে হবে। সবার উপরে থাকবে শিরোনাম। দ্বিতীয় স্লাইডটি যুক্ত করার নিয়মে আরও একটি স্লাইড যোগ করা যেতে পারে। এটি হবে তিন নম্বর স্লাইড।
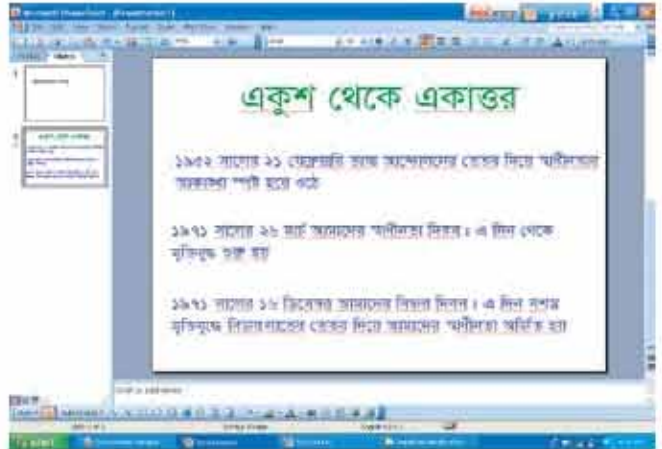
তিন নম্বর স্লাইড যোগ করার জন্য-

৪. পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে একটি টেক্সট বক্সে নতুন স্লাইডের শিরোনাম টাইপ করতে হবে "ধন্যবাদ"।

- এভাবে অনেকগুলো স্লাইড যুক্ত করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রেজেন্টেশন তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

- প্রাথমিকভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরির পর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সমগ্র উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়।
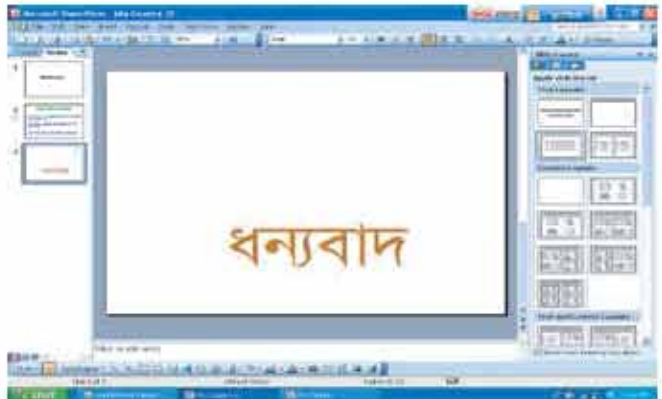
প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন

প্রেজেন্টেশনের জন্য দু একটি স্লাইড তৈরি করার পর দেখে নেওয়া যেতে পারে তৈরি স্লাইডগুলো যথাযথ হয়েছে কি-না। এ জন্য-

- কীবোর্ডের F5 বোতামে চাপ দিলে অথবা View মেনুর রিবন থেকে Slide Show সিলেক্ট করলে অথবা স্ট্যাটাস বার-এ Slide Show আইকন ক্লিক করলে প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইডটি উপস্থাপিত হবে।
- প্রেজেন্টেশনের একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য কীবোর্ডের ডানমুখী তীর বোতামে চাপ দিতে হবে। পূর্ববর্তী স্লাইডে ফেরার জন্য বামমুখী তীর বোতামে চাপ দিতে হবে।
- প্রেজেন্টেশনের মাঝামাঝি কোনো অবস্থানে থাকা অবস্থায় ওই স্লাইড থেকে পরবর্তী প্রদর্শন শুরু করার জন্য কীবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে F5 বোতামে চাপ দিতে হবে।
- স্লাইড শো উইন্ডো থেকে সম্পাদনার উইন্ডোতে ফিরে যাওয়ার জন্য কীবোর্ডের Esc বোতামে চাপ দিতে হবে।

কাজগুলো প্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে কি-না দেখে নেওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশন তৈরির যেকোনো পর্যায়ে স্লাইড প্রদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা

কোনো স্লাইড তৈরি করার সময় এবং স্লাইড তৈরির পরেও ব্যাকগ্রাউন্ডের রং পরিবর্তন করা যায়, নতুন করে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায়। যেকোনো ছবিকেও ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য বা ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করার জন্য-

১. যে স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে হবে সেই স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে বা সক্রিয় রাখতে হবে। বর্তমান প্রেজেন্টেশনে প্রথম স্লাইডটি খোলা রাখা হলো।

২. Design মেনুর রিবনে একেবারে ডান দিকে Background Style ড্রপ-ডাউন বার-এ ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট এবং সলিড রঙের একটি প্যালেট আসবে। এ প্যালেটের যে কোনো রং বা গ্রেডিয়েন্টের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করা হলে মূল স্লাইডে সেই রঙ বা গ্রেডিয়েন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাবে।

ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আরও রং, টেক্সার এবং ছবি ব্যবহার করার জন্য-

১. প্যালেটের নিচের দিকে Format Background সিলেক্ট করতে হবে। এতে Format Background ডায়ালগ বক্স আসবে।
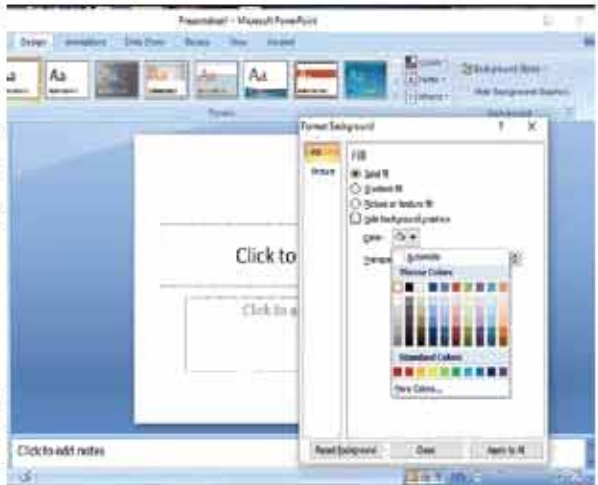
২. Format Background ডায়ালগ বক্সের উপরের বাম পাশে Solid fill রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে নিতে হবে। এরপর Color ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে রঙের প্যালেট আসবে। এ রঙের প্যালেট থেকে যে রঙের সোয়াচের উপর ক্লিক করা হবে স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেই রং আরোপিত হবে।

৩. Picture or Texture fill রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে Color -এর জায়গায় Texture ড্রপ-ডাউন আসবে। এ ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার টেক্সার প্রদর্শিত হবে। এর ভেতর থেকে যে টেক্সচারের সঙ্গে ক্লিক করা হবে, মূল স্লাইডে সেই টেক্সচার আরোপিত হবে।

৪. Picture or Texture fill রেডিও বোতাম সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় Insert from-এর নিচে File বোতামে ক্লিক করলে Insert Picture ডায়ালগ বক্স আসবে।

ডায়ালগ বক্সের যে ফোল্ডারে ছবি আছে সেই ফোল্ডার খুলে ছবি নির্বাচন করতে হবে।

৫. ডায়লগ বক্সের Insert বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং ওই ছবি স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আরোপিত হবে।

আরোপিত ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে ফেলতে Format Background ডায়লগ বক্সের Solid fill রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে। এরপর Color ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে রঙের প্যালেট আসবে। এ রঙের প্যালেট থেকে সাদা রং সিলেক্ট করতে হবে।

৬. ডায়ালগ বক্সের Close বোতামে ক্লিক করতে হবে।

স্লাইডে ছবি যুক্ত করা

অনেক সময় স্লাইডে ছবি যুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। স্লাইডে ছবি যুক্ত করার জন্য-

১. Insert মেনুর রিবনে Picture আইকনের উপর ক্লিক করলে Insert Picture ডায়ালগ বক্স আসবে।

২. Insert Picture ডায়ালগ বক্সের যে ফোল্ডারে প্রয়োজনীয় ছবিটি রয়েছে, সেই ফোল্ডার খুলতে হবে এবং ছবিটি সিলেক্ট করে ডায়ালগ বক্সের Insert বোতামে ক্লিক করতে হবে। সিলেক্ট করা ছবিটি স্লাইডে চলে আসবে।

৩. ছবিটির রিসাইজ বক্সে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবির আকার ছোট-বড় করা যাবে এবং ছবিটি ড্র্যাগ করে যে অবস্থানে প্রয়োজন সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করা

সাধারণত একটির পর একটি করে স্লাইড প্রদর্শন করা হয়। অনেক সময় একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার সময় ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। এই ইফেক্টকে বলা হয় ট্রানজিশন। প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইডটি খোলা রেখে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা হয় সেই স্লাইডটিতেই ট্রানজিশন কার্যকর হয়। প্রথম স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করার জন্য-

১. প্রথম স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে।

২. Animations মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করতে হবে।

Animations মেনুর রিবনে এক সারি স্লাইড ট্রানজিশনের নমুনা পাওয়া যাবে।

যে নমুনার উপরে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করা হবে, স্লাইডে সেই নমুনার ট্রানজিশন দেখা যাবে। আরও নমুনা থেকে বাছাই করার জন্য নমুনাগুলোর ডান দিকে তিনটি তীর রয়েছে। মাঝখানের তীরে ক্লিক করতে থাকলে নমুনার নতুন একটি করে সারি আসতে থাকবে। উপরের তীরে ক্লিক করলে উপর থেকে নিচের দিকে একটি সারি নেমে আসবে। নিচের তীরে ক্লিক করলে সবগুলো নমুনা একসঙ্গে দেখা যাবে। এভাবে ট্রানজিশনের নমুনাগুলো দেখে নেওয়া যাবে। পছন্দ হলে নমুনাটির উপর ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করা হলে ওই ট্রানজিশনটি স্লাইডে আরোপিত হবে।

৩. সবগুলো স্লাইডে একই ট্রানজিশন আরোপ করতে হলে, প্রথম স্লাইডে ট্রানজিশন আরোপ করার পর নমুনার সারির ডান দিকে Apply To All বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৪. প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হলে একটি একটি করে প্রতিটি স্লাইডে ট্রানজিশন আরোপ করতে হবে।

লেখার স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা

একটি স্লাইডে একাধিক টেক্সট বক্সে লেখা থাকতে পারে। বর্তমান প্রেজেন্টেশনের দ্বিতীয় স্লাইডে তিনটি টেক্সট বক্সে লেখা রয়েছে। তিনটি টেক্সট বক্সে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করলে টেক্সট বক্সগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্লাইডের ভেতরে আসবে। টেক্সট বক্সে ট্রানজিশন প্রয়োগের জন্য-

১. দ্বিতীয় স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে।

২. প্রথম টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করতে হবে।

৩. Animations মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করতে হবে।

Animations-এর নিচে Custom Animation নামে একটি কমান্ড যুক্ত হবে। Custom Animation-এর উপর ক্লিক করলে Custom Animation-এর একটি প্যানেল আসবে।

৪. Custom Animation প্যানেলের Add Effect ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Entrance সিলেক্ট করলে কাস্টম ট্রানজিশনের একটি তালিকা আসবে। এ তালিকা থেকে-

- প্রথম টেক্সট বক্সের জন্য Blinds সিলেক্ট করা হলো।
- দ্বিতীয় টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Fly in সিলেক্ট করা হলো।
- তৃতীয় টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Diamond সিলেক্ট করা হলো।
- এ তালিকা থেকে More Effects সিলেক্ট করলে ট্রানজিশনের আরও একটি তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে যেকোনো ট্রানজিশন সিলেক্ট করলে একই রকম কাজ হবে।

৫. আরোপিত কোনো ট্রানজিশন বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Remove বোতামে ক্লিক করতে হবে।

ট্রানজিশনে শব্দ প্রয়োগ করা

স্লাইড ট্রানজিশনের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করার জন্য স্লাইডটি খোলা রেখে Transition Sound ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে যেকোনো একটি শব্দের নাম সিলেক্ট করতে হবে। প্রথম স্লাইডের জন্য Camera সিলেক্ট করা হলো। সবগুলো স্লাইডে একই শব্দ প্রয়োগ করার জন্য Apply To All বোতামে ক্লিক করতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করার জন্য প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন করে একই নিয়মে শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

স্লাইডে ভিডিও যুক্ত করা

প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো স্লাইডে ভিডিও যুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত শুরুর স্লাইডে ভিডিও যুক্ত করা হয়। ধরা যাক, 'আমাদের দেশ' উপস্থাপনার শুরুর স্লাইডে একটি ভিডিও যুক্ত করতে হবে। এ জন্য-

- 'আমাদের দেশ' উপস্থাপনাটির প্রথম স্লাইড খোলা রাখতে হবে।
- Insert মেনুর রিবনে Movie ড্রপ-ডাউনে ক্লিক করলে Movie from file কমান্ড পাওয়া যাবে। Movie from file কমান্ড সিলেক্ট করলে Insert Movie ডায়ালগ বক্স আসবে।
- Insert Movie ডায়ালগ বক্সের ভিডিও ফোল্ডার থেকে একটি মুভি ফাইল সিলেক্ট করতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- একটি জিজ্ঞাসাসূচক বার্তা বক্স আসবে "How do you want the movie to start in the slide show?"
- বার্তা বক্সে দুটি বোতাম থাকবে- Automatically এবং When Clicked.
- প্রয়োজনীয় বোতামে ক্লিক করলে বার্তা বক্স চলে যাবে এবং স্লাইডে ভিডিও ফাইল স্থাপিত হবে। ফাইলটি ড্র্যাগ করে যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে এবং ফাইলের রিসাইজ বক্স ড্র্যাগ করে ফাইলটির আকার ছোট-বড় করা যাবে।
- কীবোর্ডের F5 বোতামে ক্লিক করলে প্রথম স্লাইডটি প্রদর্শিত হবে।
- স্লাইডে ভিডিও ফাইলের থাম্বনেইল দৃশ্যমান থাকবে।
- ভিডিও ফাইলের থাম্বনেইলে ক্লিক করলে ভিডিওটি চালু হয়ে যাবে। মুভি ফাইলটি সংযোজন করার সময় Automatically সিলেক্ট করা থাকলে স্লাইড প্রদর্শন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুভিটিও চালু হয়ে যাবে।

কাজ

তোমার বিদ্যালয় নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করে উপস্থাপন কর।

গ্রাফিক্স

গ্রাফিক্সের গুরুত্ব

কম্পিউটারের সাহায্যে ছবি সম্পাদনা করার জন্য ক্যামেরায় তোলা ছবি, হাতে আঁকা ছবি বা চিত্রকর্ম, নকশা ইত্যাদি স্ক্যান করে কম্পিউটারে ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ছবি সরাসরি কম্পিউটারে কপি করে নেওয়া যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে ছবি সম্পাদনার পর এগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে এবং কাগজে ছাপার জন্য আমন্ত্রণপত্র, পোস্টার, ব্যানার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটারে ছবি সম্পাদনার জন্য অনেক রকম প্রোগ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সুবিধা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনায় তাই এখানে এডোবি ফটোশপ এবং এডোবি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে আলোচনা করা হলো। ছবি বা ছবির কোনো অংশের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো-কমানো, একাধিক ছবির সমন্বয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা, ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলা, ছবির দাগ বা ত্রুটি মুছে ফেলা ইত্যাদি আরও নানা রকম কাজ এডোবি ফটোশপ দিয়ে করা যায়।

ফটোশপে কাজ করার জন্য আমাদের কম্পিউটারে ফটোশপ প্রোগ্রাম ইন্সটল করা থাকতে হবে অথবা তা ইন্সটল করে নিতে হবে। আগে শেখা অন্যান্য প্রোগ্রামের মতো একই পদ্ধতিতে ফটোশপ প্রোগ্রাম খুলতে হয়। নতুন ফাইল তৈরি করে অথবা আগে তৈরি করা ফাইল খুলে কাজ শুরু করতে হয়।

ফটোশপ প্রোগ্রাম খোলার জন্য–

১. Start বা Windows Logo Button এ Click করে অল প্রোগ্রামস (All Programs) কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

২. এ মেনু থেকে এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামের নামের উপর ক্লিক করলে এডোবি ফটোশপ (Adobe Photoshop) প্রোগ্রাম খুলে যাবে।

ফটোশপ প্রোগ্রামে নতুন ফাইল তৈরি করার জন্য-

- ফটোশপ প্রোগ্রাম খোলার পর File মেনু থেকে New কমান্ড দিলে New ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- নিউ ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Untitled-1 লেখাটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে। কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিয়ে লেখাটি মুছে ফেলতে হবে এবং একটি নাম টাইপ করতে হবে। এটিই হবে ফাইলের নাম। ধরা যাক, Name ঘরে Practice টাইপ করা হলো।

  এ পর্যায়ে ফাইলের নাম টাইপ করে নিলে পরবর্তীতে ফাইলটি বন্ধ করার সময় আর নতুন করে নাম টাইপ করতে হবে না। অন্যথায়, ফাইল বন্ধ করার সময় নাম টাইপ করার জন্য ডায়ালগ বক্স আসবে।
- নিউ ডায়ালগ বক্সে প্রশস্ততা বা Width এবং উচ্চতা বা Height ঘরে ইঞ্চির মাপে সংখ্যা টাইপ করতে হবে। যেমন- প্রশস্ততা ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৮ ইঞ্চি টাইপ করতে হবে। এ দুটি ঘরের ডান পাশে মাপের একক নির্ধারণের ড্রপ-ডাউন মেনু রয়েছে। এ মেনুর নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে মাপের

একককগুলো দেখা যাবে। যেমন - Inches, Pixels, Picas, Points, cm এবং mm. এ ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে প্রয়োজনীয় একক সিলেক্ট করতে হবে। শুরুতে হয়তো পিক্সেল থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মে ইঞ্চির মাপ নির্ধারণ করতে হবে। ধরা যাক, বর্তমান কাজের জন্য একক হিসেবে Inches নির্ধারণ করে প্রশস্ততা ঘরে ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ঘরে ৮ ইঞ্চি টাইপ করা হলো।

- আপাতত রেজুলিউশন ৭২ পিক্সেল অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

ফটোশপে ইমেজ বা ছবি তৈরি হয় পিক্সেলের সাহায্যে। পিক্সেল হচ্ছে একটি ইমেজ বা ছবির বর্গাকার ক্ষুদ্রতম একক। ইঞ্চি প্রতি ৭২ পিক্সেল কথাটির অর্থ হচ্ছে এক ইঞ্চিতে আড়াআড়ি এবং উলম্বভাবে ৭২টি পিক্সেলের ৭২টি করে লাইন। এতে এক বর্গ ইঞ্চিতে মোট পিক্সেলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭২x৭২=৫১৮৪ পিক্সেল। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বা নির্দিষ্ট এককে পিক্সেলের পরিমাণকেই রেজুলিউশন বলা হয়। পিক্সেলের ঘরে ১৩০ টাইপ করলে রেজুলিউশন হবে ১৩০x১৩০=১৬,৯০০ পিক্সেল। একটি ছবি বড় করলে পিক্সেলগুলো দেখা যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় পিক্সেলেটেড হয়ে যাওয়া। সাধারণ ভাষায় বলা হয় ছবি ফেটে যাওয়া।

- ডায়ালগ বক্সের Color Mode ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে RGB, CMYK, Bitmap, Grayscale), Lab Color-এর ভেতর থেকে RGB সিলেক্ট করা যেতে পারে। কারণ, কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মনিটরে উপস্থাপিত বিষয় প্রদর্শিত হয় RGB মোডে। RGB হচ্ছে Red,Green এবং Blue বা লাল,সবুজ এবং নীল এই তিনটি রঙের ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত রূপ।
- ডায়ালগ বক্সের Background Contents অংশে ব্যাকগ্রাউন্ডের ৩টি অপশন রয়েছে। অপশন ৩টি হচ্ছে সাদা বা White, Background Color এবং স্বচ্ছ বা Transparent.
- ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে সাদা বা White সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background-এর রং হবে সাদা, Background Color সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background-এর রং হবে টুল বক্সে ব্যাকগ্রউন্ডের রং হিসেবে বিদ্যমান রং বিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ বা Transparent সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background স্বচ্ছ থাকবে। স্বচ্ছ Background-এর পুরোটাই হবে রংবিহীন চেকবিশিষ্ট। পছন্দ বা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশন সিলেক্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাদা বা White সিলেক্ট করা যেতে পারে।
- উপরে বর্ণিত ধাপসমূহ সম্পন্ন না করে সরাসরি Preset ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Default Photoshop Size সিলেক্ট করা যেতে পারে। এতে ফটোশপের নিজস্ব মাপ অনুযায়ী সবগুলো একক নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজ শেখার প্রথম পর্যায়ে Default Photoshop Size সিলেক্ট করা যেতে পারে।
- ডায়ালগ বক্সের মাপজোক নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করে OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সে প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী একটি উইন্ডো বা পর্দা আসবে। পর্দার উপরের বাম দিকে Practice @ ১০০% (RGB/8) লেখা থাকবে। এ বারটিকে বলা হয় টাইটেল বার। নিউ ডায়লগ বক্সের Name ঘরে ফাইলটির জন্য কোনো নাম ব্যবহার না করা হলে টাইটেল বার-এর এ জায়গাটিতে ফাইলের নাম হিসেবে Untitled-1@ ১০০% (RGB/8) প্রদর্শিত হবে।
- টাইটেল বার-এর উপর ডবলক্লিক করলে টাইটেল বারটি পর্দার উপরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।
- টাইটেল বার-এর নিচে মেনু বার এবং মেনু বার-এর নিচে রয়েছে অপশন বার।
- অপশন বার-এর নিচে রয়েছে রুলার।
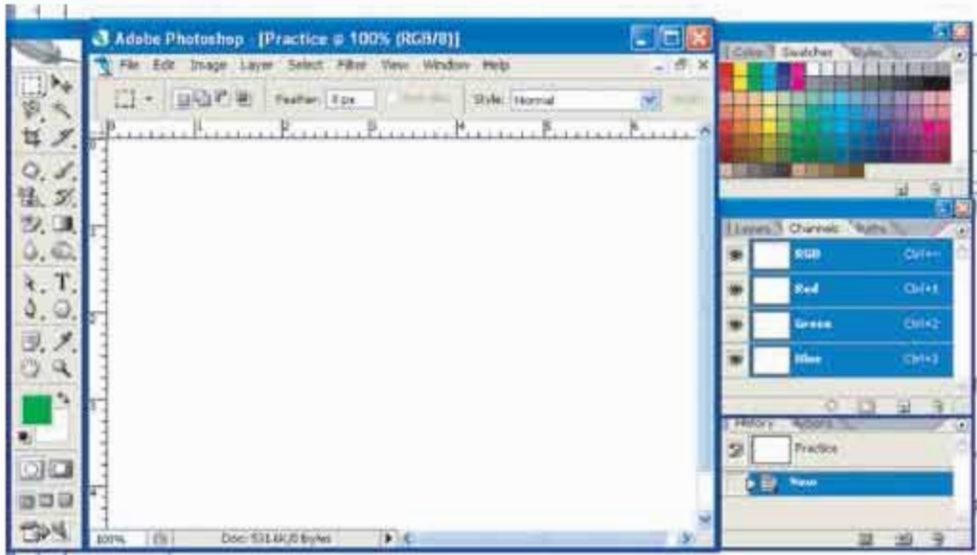
- মুনাশের নিচের পর্দায় ফটোশপের কাজ করতে হয়।
- এ পর্দাটিকে শিল্পীর ছবি আঁকার ক্যানভাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই ক্যানভাসের বাম পাশে রয়েছে তুলি বা ব্রাশ এবং রং ও ছবি সম্পাদনা করার বিভিন্ন প্রকার টুল এবং ডান পাশে রয়েছে প্যালেট।

ফটোশপের টুলবক্স এবং প্যালেট পরিচিতি

ফটোশপে কাজ করার জন্য কমবেশি ৬৯ প্রকার টুল রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অপশন প্যালেট, ডায়ালগ বক্স ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম টুলের সঙ্গে আবার বিভিন্ন রকম অপশন প্যালেট এবং ডায়ালগ বক্সের সম্পর্ক রয়েছে।

ফটোশপের টুল বক্সে এ ছাড়াও রয়েছে তুলি বা ব্রাশের রং বা Foreground এবং ক্যানভাস বা Background-এর রং নিয়ন্ত্রণের আইকন, মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন এলাকা নির্ধারণের আইকন, মাস্ক আইকন ইত্যাদি। পেন্সিল বা ব্রাশ টুল দিয়ে রেখা অঙ্কন করলে Foreground-এর রং তুলির রং হিসেবে কাজ করে।

- পর্দার ডান পাশে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার প্যালেট। প্যালেটের উপরের ডান দিকে বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize আইকন রয়েছে। এ বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize
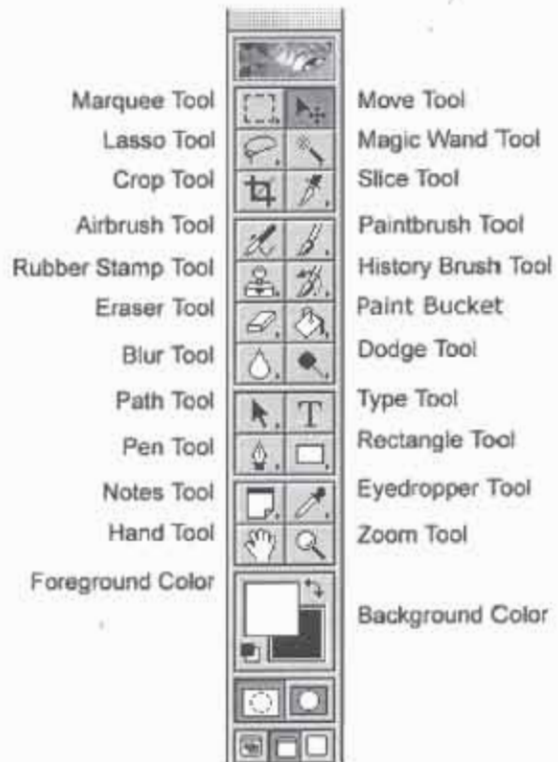
আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি গুটিয়ে যাবে এবং আইকনটি চতুষ্কোণ বা Maximize আইকনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। গুটিয়ে থাকা প্যালেটের চতুষ্কোণ বা Maximize আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি আবার সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আবার বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি গুটিয়ে যাবে।

- প্যালেটের টপ বার-এ ডাবলক্লিক করলেও সম্প্রসারিত প্যালেট গুটিয়ে যাবে এবং গুটিয়ে থাকা প্যালেট সম্প্রসারিত হবে।
- প্যালেটের টপ বার-এ ক্লিক ও ড্রাগ করে প্যালেটকে যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যায়।
- পর্দার বাম দিকে রয়েছে টুল বক্স। এতে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টুল রয়েছে। কাজের জন্য যে টুলের উপর যখন ক্লিক করা হয় তখন সেই টুলটি সক্রিয় হয়। টুল বক্সে কোনো টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে কখনো ওই টুলের নিজস্ব আকৃতিতে দেখা যায়, আবার কখনো যোগ চিহ্নরূপে দেখা যায় এবং সম্পাদনা টুলগুলো বৃত্ত বা গোল আকৃতি হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

সিলেকশন টুল এবং মুভ টুল পরিচিতি

- টুল বক্সের একেবারে উপরের অংশে রয়েছে ৩টি সিলেকশন টুল এবং একটি মুভ টুল। কিছু টুলের নিচের ডান দিকে ছোট তীর চিহ্নের z রয়েছে। এতে বোঝা যাবে ওই সকল টুলের একই অবস্থানে একই গোত্রের আরও টুল রয়েছে। যেমন- একই অবস্থানে রয়েছে চারটি মার্কি টুল এবং অন্য অবস্থানে রয়েছে তিনটি লাসো টুল।
- টুলের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে টুলের নাম প্রদর্শিত হবে। মাউস পয়েন্টার দিয়ে ওই টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সক্রিয় হবে। এ অবস্থায় মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে সিলেক্টেড টুলের নিজস্ব আকৃতিতে বা যোগচিহ্ন রূপে দেখা যাবে।
- সিলেকশন টুলের মধ্যে মার্কি টুল দিয়ে চতুষ্কোণ ও বৃত্তাকার সিলেকশন এবং অবজেক্ট তৈরির কাজ করা যায়।
- Shift বোতাম চেপে রেখে Rectangular Marquee Tool ড্র্যাগ করলে নিখুঁত বর্গ এবং Shift বোতাম চেপে রেখে Elliptical Marquee Tool ড্র্যাগ করলে নিখুঁত বৃত্ত সিলেকশন তৈরি হবে। Alt বোতাম চেপে ড্র্যাগ করলে কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে বর্গ/ বৃত্ত সিলেকশন তৈরি হবে।

সিলেকশন স্থানান্তরিত করা

- Rectangular Marquee Tool-এর সাহায্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সিলেকশন রেখা তৈরি করার পর মাউস থেকে আঙুল তুলে নিলে পর্দায় চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সিলেকশন রেখা ভাসমান অবস্থায় থাকবে।
- মাউস পয়েন্টার সিলেকশনের ভেতরে নিয়ে গেলে মাউস পয়েন্টারের নিচের দিকে ছোট একটি আয়তকার আইকন দেখা যাবে। এ অবস্থায় মাউসে আঙুলের চাপ রেখে ভাসমান সিলেকশনকে ড্র্যাগ করে যে কোন স্থানে সরিয়ে নেওয়া যাবে।
- সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় Select মেনুর Deselect কমান্ড সিলেক্ট করলে অথবা সিলেকশনের বাইরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে সিলেকশন চলে যাবে।

ভাসমান সিলেকশনটি রঙ দিয়ে পূরণ করা

- টুল বক্সের নিচের অংশে Foreground এবং Background কালার আইকন রয়েছে। উপরের আইকনটি হচ্ছে Foreground-এর এবং নিচের আইকনটি হচ্ছে Background- এর। কোনো সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় রং দিয়ে পূরণ করার জন্য–

- কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে Backspace বোতামে চাপ দিলে সিলেকশনটি তুলির রং বা Foreground-এর রঙে পূরণ হয়ে যাবে এবং Ctrl বোতাম চেপে রেখে Backspace বোতামে চাপ দিলে বা শুধু Backspace বোতামে চাপ দিলে ক্যানভাসের রং বা Background-এর রঙে পূরণ হয়ে যাবে।
- রঙে পূরণ হওয়া সিলেকশনটি ভাসমান থাকবে। প্রয়োজন হলে ড্র্যাগ করে অন্য স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।
- সিলেকশন সরিয়ে নেওয়ার সময় রং দিয়ে পূরণ করা অবজেক্ট পূর্ববর্তী স্থানেই থেকে যাবে।
- Ctrl বোতাম চেপে রেখে স্থানান্তরিত করলে অবজেক্টটি কাট হয়ে স্থানান্তরিত হবে।
- Ctrl ও Alt বোতাম একসঙ্গে চেপে রেখে স্থানান্তরিত করলে অবজেক্টটি কপি হয়ে স্থানান্তরিত হবে।
- ভাসমান সিলেকশনের বাইরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে সিলেকশনটি চলে যাবে।

ফেদার-এর ব্যবহার

- অপশন বার-এ Feather ঘরে ০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করে অবজেক্টের প্রান্ত নমনীয় করা যায়। ফেদারের পরিমাণ অবজেক্টের প্রান্ত থেকে ভেতর ও বাইরের দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হয়। ফেদার ঘরে ১০ টাইপ করলে প্রান্তের নমনীয়তা হবে ২০।
- ফেদার ঘরে বিভিন্ন পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করার পর কীবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে ফেদার বৈশিষ্ট্যকে কার্যকর করে নিতে হবে। এরপর মার্কি টুল বা অন্য টুল দিয়ে তৈরি করা রং দিয়ে পূরণ করলে ফেদার বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হবে। কপি বা কাট করা অবজেক্ট পেস্ট করার পরও ফেদার বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হবে।

ল্যাসো টুল ও পলিগোনাল ল্যাসো টুলের সাহায্যে সিলেক্ট করা

টুল বক্সের ল্যাসো টুল সিলেক্ট করতে হবে। ল্যাসো টুল দিয়ে কয়েক প্রকার সিলেকশন তৈরি করা যেতে পারে। যেমন –

- মুক্ত সিলেকশন তৈরি করার জন্য Lasso Tool সিলেক্ট করার পর ক্যানভাসে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অনুভাকার এবং আঁকাবাঁকা সীমানা বা প্রান্তবিশিষ্ট সিলেকশন তৈরির কাজ করা যায়। ড্র্যাগ করা অবস্থায় মাউসের উপর থেকে আঙুলের চাপ ছেড়ে দিলে ঐ অবস্থান থেকে শুরুর ক্লিকের বিন্দুর সঙ্গে রেখা তৈরি হয়ে বদ্ধ সিলেকশন তৈরি হবে।
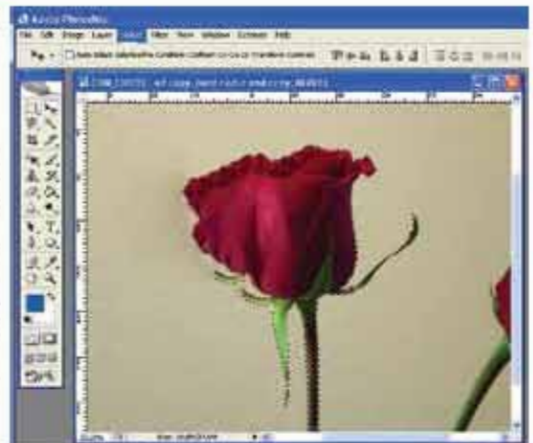
- সিলেকশন ভাসমান (Floating) থাকা অবস্থায় সিলেকশনের মধ্যে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে অন্যত্র সরিয়ে স্থাপন করা যাবে। সিলেকশন কোনো রং দিয়ে পূরণ (Fill) করার পরও ভাসমান সিলেকশন ড্র্যাগ করে অন্যত্র সরিয়ে স্থাপন করে একই রং বা অন্য কোনো রং দিয়ে পূরণ করা যাবে।
- রঙের গাঢ়ত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ওপাসিটি (Opacity) ব্যবহার করা হয়।
- Edit মেনুর Fill কমান্ড দিলে পর্দায় ফিল ডায়ালগ বক্স পাওয়া যায়।
- ফিল ডায়ালগ বক্সের কনটেন্টস অংশে ইউজ ঘরে ফোরগ্রাউন্ড সিলেক্টেড থাকে। প্রয়োজন হলে ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।
- ডায়ালগ বক্সের ওপাসিটি ঘরে রঙের গাঢ়ত্ব নির্ধারণী সংখ্যা টাইপ করতে হয়। রঙের পূর্ণ গাঢ়ত্ব হচ্ছে ১০০%। শতকরা হার (%) যত কম হবে রং ততই হালকা হবে। ওপাসিটি ঘরে ৫০ টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেকশনটি ফোরগ্রাউন্ড রঙের ৫০% গাঢ়তায় পূরণ হবে।
- সিলেকশনের অপশন প্যালেটেও ওপাসিটি আছে। এ প্যালেটের ওপাসিটি কমবেশি করেও পূরণ করা রঙের গাঢ়তা কমবেশি করা যায়।

স্ট্রোক

- স্ট্রোক কমান্ডের সাহায্যে সিলেকশনের বর্ডার তৈরি করা যায়।
- সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় Edit মেনুর Stroke কমান্ড সিলেক্ট করলে Stroke ডায়ালগ বক্স পাওয়া যায়।
- ডায়ালগ বক্সের Stroke Width ঘরে ১-১৬ পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা টাইপ করা যায়। এ সংখ্যা অনুযায়ী বর্ডারের প্রশস্ততা নির্ধারিত হয়। বর্ডারটি সিলেকশনের বাইরের দিকে, ভেতরের দিকে বা মাঝামাঝি স্থানে তৈরির জন্য- ডায়ালগ বক্সের Outside, Inside বা Center সংযুক্ত গোলক বা Radio button-এর মাঝখানে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- স্ট্রোক পদ্ধতিতে শুধু তুলির রং বা ফোরগ্রাউন্ডের রং দিয়েই বর্ডার তৈরি করা যায়।

ফাইল সেভ বা সংরক্ষণ বন্ধ করা

- ফাইল মেনু থেকে Save কমান্ড দিলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।
- সেভ এ্যাজ (Save As) ডায়ালগ বক্সের ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, Practice.
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে ফাইলটি Practice নামে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
- অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে Practice ফাইলটি খুলে নিতে হবে।

লেয়ার

অবজেক্ট তৈরি করা এবং ছবি সম্পাদনার কাজ শুরু করার আগে Layer সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ছবি সম্পাদনার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে Layer-এর মাধ্যমে কাজ করতে হয়।

Layer হচ্ছে, ছবি সম্পাদনার পর্দা বা ক্যানভাসের একেকটি স্তর। লেয়ার পদ্ধতিতে একাধিক স্বচ্ছ ক্যানভাস একটির উপরে একটি রেখে কাজ করা যায়। ক্যানভাস স্বচ্ছ হলে প্রতি স্তরে বিদ্যমান ছবি দেখে দেখে কাজ করা যায়। কিন্তু, উপরের স্তরের ক্যানভাসটি স্বচ্ছ না হলে নিচের ক্যানভাসের কাজ দেখা যাবে না। রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ড বিশিষ্ট কোনো ছবি খোলা হলে ওই ছবির লেয়ার প্যালেটে Background লেখা থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা রঙের হলেও স্বচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ড হবে না। কারণ, সাদা একটি রং। উদাহরণ হিসেবে-

- একটি ফুলের ছবি বিশিষ্ট একটি ফাইল খোলা হলো। ছবির লেয়ার প্যালেটে Background লেখা রয়েছে। লেয়ার বার-এর ডান দিকে একটি তালার আইকন রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে লেয়ারটি লক করা আছে। লক করা লেয়ারের অবজেক্ট মুভ টুলের সাহায্যে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে স্থানান্তরিত করা যায় না।

- নতুন ফাইল খোলার সময় Background Content হিসেবে হোয়াইট বা সাদা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা হলে লেয়ার প্যালেটে Background প্রদর্শিত হবে।
- বর্তমান উদাহরণের ফুলের ছবিটি এদিক-সেদিক সরিয়ে স্থাপন করার জন্য Background-কে লেয়ারে পরিণত করে নিতে হবে। এ জন্য–
- লেয়ার প্যালেটে Background-এর উপর ডাবলক্লিক করলে New Layer নামে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer 0 থাকবে। ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং Background লেয়ার Layer 0-এ পরিণত হবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer 0 মুছে Layer 1 টাইপ করলে Background লেয়ারটি Layer 1-এ পরিণত হবে।

- Background Eraser টুল দিয়ে ছবির যেকোনো অংশে ক্লিক করলে ছবির ওই অংশ মুছে যাবে এবং প্যালেটের লেয়ারটি আপনাআপনি Layer 0-এ পরিণত হবে।
- Eraser টুল দিয়ে ছবির কোনো অংশ মোছা হলে লেয়ারটি Layer 0-এ পরিণত হবে না।

নতুন লেয়ার যুক্ত করা

ফটোশপে একাধিক ছবির ফাইল নিয়ে কাজ করার জন্য একাধিক লেয়ার ব্যবহার করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ছবি ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে রেখে তাদের অবস্থান বিন্যাসসহ অন্যান্য সম্পাদনার কাজ করতে হয়।

প্যালেটে নতুন লেয়ার যুক্ত করার জন্য-

- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে বিদ্যমান লেয়ার বা সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এ লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার। নতুন যুক্ত করা লেয়ারে কোনো অবজেক্ট তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী সরিয়ে স্থাপন করা যাবে। এভাবে পাঁচটি লেয়ার তৈরি করলে ১ নম্বর লেয়ারের উপরে ২ নম্বর লেয়ার, ২ নম্বর লেয়ারের উপর ৩ নম্বর লেয়ার, ৩ নম্বর লেয়ারের উপর ৪ নম্বর লেয়ার বিন্যস্ত হবে। আরো লেয়ার যুক্ত করা হলে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হবে।
- প্রয়োজন হলে লেয়ারের স্তর বিন্যাস পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। ২ নম্বর লেয়ারে ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে উপরের দিকে ড্র্যাগ করে ৩ নম্বর লেয়ারের উপর ছেড়ে দিলে লেয়ারটি ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর লেয়ারের মাঝখানে স্থাপিত হবে। দুটি লেয়ারের মাঝখানের বিভাজন রেখা সিলেক্টেড হওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এভাবে স্থানান্তরিত করা যাবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার অন্য কোনো স্তরে স্থাপন করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডকে লেয়ারে পরিণত করে নিতে হবে।

লেয়ারে ছবি দৃশ্যমান করা ও অদৃশ্য করা

প্রতিটি লেয়ারের একেবারে বাম দিকে রয়েছে চোখের আইকন। এ আইকনকে বলা হয় লেয়ার ভিজিবিলিটি আইকন। চোখের আইকনটির উপর ক্লিক করলে চোখটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে ওই লেয়ারের ছবিটিও পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। অদৃশ্য চোখের জায়গাটিতে আবার ক্লিক করলে চোখের আইকনটি দৃশ্যমান হবে এবং সেইসঙ্গে ওই লেয়ারের ছবিও পর্দায় দৃশ্যমান হবে। ফুলের ছবির লেয়ারকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য করে দেখা যেতে পারে।

থাম্বনেইল আইকন

- চোখ আইকনের ডান পাশের সারিতে রয়েছে থাম্বনেইল আইকন। থাম্বনেইলের অর্থ হচ্ছে বড় ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ। পর্দার ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেয়ারে ওই ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রদর্শিত হয় এই থাম্বনেইল আইকনে। এতে কোন লেয়ারে কোন ছবি রয়েছে দেখে দেখে কাজ করতে সুবিধা হয়।

গুচ্ছ প্যালেট এবং প্যালেট যুক্ত ও বিযুক্ত করা

একই সঙ্গে একাধিক প্যালেট এক সাথে থাকতে পারে। যেমন- Layer, Path এবং Channel একই সঙ্গে থাকতে পারে। প্যালেটগুলোর নাম ট্যাব আকারে থাকবে। যখন যে ট্যাবে ক্লিক করা হবে তখন সেই প্যালেটটি সক্রিয় হবে। এভাবে একসঙ্গে একাধিক প্যালেটের যুক্ত অবস্থাকে বলা হয় গুচ্ছ প্যালেট।

- বর্তমানে প্যালেটটি Layer প্যালেট হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। Layer ট্যাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে প্যালেটের বাইরে এনে ছেড়ে দিলে Layer প্যালেটটি স্বতন্ত্র প্যালেট বা একক প্যালেট হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।
- আবার স্বতন্ত্র Layer প্যালেটটির ট্যাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অন্য প্যালেটের ভেতরে নিয়ে গেলে যখন প্যালেটের চারদিকে মোটা রেখা দৃশ্যমান হবে তখন মাউস থেকে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। এতে ড্র্যাগ করে নেওয়া লেয়ারটি ওই গুচ্ছ প্যালেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
- পর্দায় Layer প্যালেট বিদ্যমান না থাকলে Window মেনু থেকে Layers কমান্ড সিলেক্ট করলে পর্দায় লেয়ার প্যালেট পাওয়া যাবে।

লেয়ারে অবজেক্ট তৈরি করা

সিলেকশন তৈরি এবং রং দিয়ে পূরণ করার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। এ পর্যায়ে আয়তকার সিলেকশন টুল এবং বৃত্তাকার সিলেকশন টুল দিয়ে খুব সাধারণ দুটি অবজেক্ট তৈরি করা এবং সেই সঙ্গে টেক্সট টুলের সাহায্যে লেখার পদ্ধতি শিখব।

ক. ১ নম্বর লেয়ারে আয়তকার অবজেক্ট তৈরি করা –

- New ডায়ালগ বক্সের Background Contents অপশন থেকে সাদা বা White সিলেক্ট করলে লেয়ার প্যালেটে ভিত্তি লেয়ার হিসেবে Background থাকবে। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের উপর একটি স্বচ্ছ লেয়ার তৈরি করে নেওয়ার জন্য-
- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এটি হবে ১ নম্বর লেয়ার এবং লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার।
- Layer ১ বা ১ নম্বর লেয়ারে চতুর্ভুজ মার্কি টুল বা Rectangular Marquee tool-এর সাহায্যে আয়তকার সিলেকশন তৈরি করতে হবে এবং সিলেকশনটি সবুজ রং দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- তৈরি করা আয়তকার অবজেক্টটি মুভ টুলের সাহায্যে ক্যানভাসের যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

খ. ২ নম্বর লেয়ার যোগ করা এবং বৃত্তাকার অবজেক্ট তৈরি করা –

- ১ নম্বর লেয়ারের উপর ক্লিক করলে লেয়ারটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে।
- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এটি হবে ২ নম্বর লেয়ার এবং লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার।

অথবা

- লেয়ার প্যালেটের ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে New Layer কমান্ড সিলেক্ট করলে New Layer ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer-2 প্রদর্শিত হবে। Name ঘরে নতুন নাম হিসেবে Circle টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং লেয়ার প্যালেটে ১ নম্বর লেয়ারের উপরে Circle নামে নতুন লেয়ার যুক্ত হবে।
- এবার বৃত্তাকার মার্কি টুল দিয়ে এমনভাবে গোলাকার সিলেকশন তৈরি করতে হবে যেন বৃত্তের অর্ধেকটা সবুজ জমিনের উপরে এবং অর্ধেকটা বাইরে সাদা অংশে থাকে।
- সিলেকশনকে লাল রং দিয়ে ফিল বা পূরণ করতে হবে। এখন Circle লেয়ারের থাম্বনেইলে লাল বৃত্ত দেখা যাবে।

গ. টেক্সট লেয়ার তৈরি করা

- মনে রাখতে হবে, Type টুলের সাহায্যে টাইপের কাজ শুরু করলে ওই লেখা আপনাআপনি নতুন Text লেয়ারে তৈরি হবে। নতুন Text লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার। Text লেয়ারে লেখার কাজ করার জন্য-

- টুল বক্স থেকে Type টুল সিলেক্ট করে ক্যানভাসের উপর ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে লেয়ার প্যালেটে নতুন লেয়ার যুক্ত হবে।
- Text টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার ক্যানভাসের উপর ক্লিক করলে লেখার ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য অপশন বার-এ প্রয়োজনীয় ড্রপ-ডাউন অপশন তালিকা পাওয়া যাবে।
- ফন্ট ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে সুতন্বী এমজে ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে।
- ফন্ট সাইজ ফন্ট ড্রপ- ডাউন তালিকা থেকে অক্ষরের আকার আপাতত ৭২ পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।
- ফন্টে রঙ আপাতত কালো রাখা যায়।
- এবার 'সোনার বাংলা' টাইপ করা হলো। লেখাটি নতুন লেয়ার হিসেবে যুক্ত হবে। লেয়ার প্যালেটে Text লেয়ারটি থাম্বনেইল হিসেবে T বর্ণ থাকবে।
- টাইপের কাজ শেষ করার পর মুভ টুল বা মাউস পয়েন্টারের সাহায্যে লেখাকে যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে বসানো যাবে।
- এবার মুভ টুলের সাহায্যে চতুর্ভুজ, বৃত্ত এবং লেখা বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে স্থাপন করে দেখা যেতে পারে।
- অবজেক্ট তিনটির সমন্বিত অবস্থান সন্তোষজনক হলে ফাইলটি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সেভ বা সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

এক ফাইলের ছবি অন্য ফাইলে স্থানান্তরিত করা

একসঙ্গে একাধিক ছবি নিয়ে কাজ করার জন্য একটি ফাইলে সবগুলো ছবি স্থানান্তরিত করে নিতে হয়। এ জন্য ধরা যাক, Default Photoshop Size -এর একটি শূন্য ফাইল তৈরি করা হলো। এরপর Banana নামের কলার ছবি বিশিষ্ট ফাইল খোলা হলো। এবার মুভ টুল দিয়ে কলার ছবির উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে শূন্য ফাইলের উইন্ডোর ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এতে কলার ছবিটি কপি হয়ে শূন্য ফাইলে চলে যাবে। কলার ফাইলটি বন্ধ করে দিতে হবে।

একই পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আম, আনারস ইত্যাদি আরও ছবি নতুন তৈরি করা ফাইলে স্থানান্তরিত করে নেওয়া যাবে।
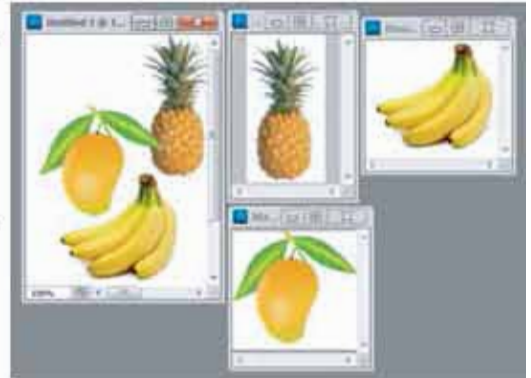
টার্গেট লেয়ার নির্ধারণ করা

- যে লেয়ারের ছবি সম্পাদনার কাজ করা হয় সেই লেয়ারটিকে বলা হয় Target Layer.
- যে কোনো সময় যেকোনো লেয়ারের ছবি সম্পাদনার কাজ করা যায় তবে একসঙ্গে একটিমাত্র লেয়ারের ছবিই সম্পাদনা করা যায়।

কোনো লেয়ারকে টার্গেট লেয়ারে পরিণত করার জন্য–

- লেয়ারটির উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলেই ঐ লেয়ারটি টার্গেট লেয়ারে পরিণত হয়। লেয়ারটিকে তখন সিলেক্টেড দেখা যায়।

লেয়ারের ওপাসিটি পরিবর্তন করা

- Opacity হচ্ছে রঙের গাঢ়ত্ব। লেয়ার প্যালেটের উপরের ডান দিকে Opacity টেক্সট বক্সে ১০০% বিদ্যমান থাকে। Opacity লেখার উপরে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে মাউস পয়েন্টার দ্বিমুখী তীরে পরিণত হবে। দ্বিমুখী তীরটি বাম দিকে ড্র্যাগ করলে Opacity বা রঙের গাঢ়ত্ব কমবে এবং ডানে সরিয়ে নিলে Opacity বা রঙের গাঢ়ত্ব বাড়বে।
- এ ছাড়া, Opacity টেক্সট বক্সে সরাসরি পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করেও Opacity কম-বেশি করা যায়।

লেয়ার বাতিল করে দেওয়া

যে লেয়ারটি বাতিল করতে হবে বা ফেলে দিতে হবে সেই লেয়ারটি অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে। এরপর-

- লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে Delete Layer কমান্ড দিতে হবে।

অথবা

- লেয়ারটি সিলেক্ট করে প্যালেটের নিচের সারিতে Delete Layer আইকনে ক্লিক করলে একটি জিজ্ঞাসাসূচক ডায়ালগ বক্স আসবে 'আপনি ঐ লেয়ারটি মুছে ফেলতে চান কি-না?' হ্যাঁ বা Yes বোতামে ক্লিক করলে লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে। 'না' বা No বোতামে ক্লিক করলে বাতিল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

একাধিক লেয়ার একীভূত করা

ফটোশপে কাজ করার জন্য অনেক সময় অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজ শেষ করার পর অন্য কোনো কম্পিউটারে বা প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন হলে সম্পাদিত কাজটি সিডি বা পেন ড্রাইভে কপি করে নিতে হয়। এ জন্য ফাইলের আকার ছোট রাখার চেষ্টা করা হয়। লেয়ারগুলো একীভূত করে নিলে ফাইলের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।

একাধিক লেয়ার একীভূত করার জন্য-

- লেয়ারস প্যালেটের পপ-আপ মেনুতে Merge Visible, Flatten Image এবং Merge Down নামে তিনটি কমান্ড রয়েছে।
- কোনো লেয়ার যদি অদৃশ্য থাকে তাহলে Merge Visible কমান্ড দিলে শুধু দৃশ্যমান লেয়ারগুলো একীভূত হবে। অদৃশ্য লেয়ারটি একীভূত হবে না।
- Merge Down কমান্ড দিলে সিলেক্ট করা লেয়ার এবং ঠিক তার নিচের লেয়ার একীভূত হবে।
- Flatten Image কমান্ড দিলে সবগুলো লেয়ার একীভূত হয়ে যাবে।
- কোনো লেয়ার অদৃশ্য থাকলে ওই লেয়ারটি বাতিল করা হবে কি-না, এ মর্মে জিজ্ঞাসাসূচক বার্তা আসবে। Yes বোতামে ক্লিক করলে অদৃশ্য লেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং দৃশ্যমান লেয়ারগুলো একীভূত হয়ে যাবে।

কাট, কপি, পেস্ট ও পেস্ট ইনটু

কোনো অবজেক্ট বা ইমেজ সম্পূর্ণভাবে সিলেক্ট করে বা নির্দিষ্ট কোনো অংশ সিলেক্ট করে কাট, কপি ও পেস্ট কমান্ড কার্যকর করতে হয়।

কাট বা কপি করা কোনো বিষয় পেস্ট করলে আপনাআপনি নতুন লেয়ার তৈরি হয় এবং পেস্ট করা অবজেক্ট নতুন লেয়ারে পেস্ট হয়। তবে, পেস্ট করার আগেই যদি স্বচ্ছ লেয়ার তৈরি করে নেওয়া হয়, তাহলে কাট বা কপি করা কোনো বিষয় ওই লেয়ারেই পেস্ট হয়।

ক্রপ টুলের ব্যবহার

বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ছবির বর্ডার বা প্রান্ত নিখুঁত এবং মসৃণ নাও হতে পারে। প্রান্তভাগ থেকে কিছুটা অংশ ছেঁটে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

এ ছাড়া, ছবিটি সমান্তরাল না হয়ে, যেকোনো দিক বাঁকা হয়ে থাকতে পারে বা হেলে থাকতে পারে।

ছবি সম্পাদনার শুরুতে এ ধরনের সমস্যা বা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে। ছবি ছেঁটে ফেলার কাজ করতে হয় Crop টুলের সাহায্যে। Crop শব্দের অর্থ হচ্ছে ছেঁটে ফেলা।

- পুরোনো এই ছবিটির চারদিকের প্রান্ত বা বর্ডার এবড়োথেবড়ো হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ছবি সম্পাদনার প্রথম কাজটিই হবে এর এবড়োথেবড়ো প্রান্ত বা বর্ডার ছেঁটে ফেলা। এ জন্য–
- টুল বক্স থেকে Crop Tool সিলেক্ট করতে হবে।
- আয়তকার মার্কি টুলের মতো ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবির এবড়োথেবড়ো প্রান্ত বা বর্ডার অংশটুকু বাইরে রেখে ভেতরের প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করতে হবে।
- সিলেকশনের চার বাহুতে চারটি এবং চার কোণে চারটি মোট আটটি ফাঁপা চতুষ্কোণ বক্স দেখা যাবে। এই চতুষ্কোণ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে সিলেকশনের এলাকা বাড়ানো-কমানো যাবে।
- সিলেকশন এলাকা চূড়ান্ত করার পর কীবোর্ডের Enter বোতামে চাপ দিলে সিলেকশনের বাইরের অংশটুকু বাদ পড়ে যাবে।
- সিলেক্ট করার পর যদি মনে হয় ক্রপ করার কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন, তাহলে কীবোর্ডের Esc বোতামে চাপ দিলে সিলেকশন চলে যাবে। প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে সিলেক্ট করা যাবে।

হেলানো ছবি ক্রপ করা

- কোনো হেলানো ছবি ক্রপ করার ক্ষেত্রে ছবিটি ফটোশপে প্রদর্শিত অবস্থায় ফাইল মেনু থেকে Automate কমান্ডের সাব-মেনু থেকে Crop and Straighten Photos কমান্ড সিলেক্ট করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছবিটি ক্রপ হয়ে সোজাভাবে স্থাপিত হবে। এ পদ্ধতি শুধু এক রঙের সলিড ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যাকগ্রাউন্ড একাধিক রংবিশিষ্ট হলে এ পদ্ধতিতে ক্রপিংয়ের কাজ করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে–

- ক্রপ টুল দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে।
- সিলেকশনের হ্যান্ডেলগুলোর যেকোনো কোণে মাউস পয়েন্টার বাঁকানো পয়েন্টারে বা রোটেট টুলে পরিণত হবে। এ টুলের সাহায্যে সিলেকশনকে ঘুরিয়ে ছবির হেলানো অবস্থার সঙ্গে স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য হ্যান্ডেলের সাহায্যে ক্রপিংয়ের এলাকা চূড়ান্ত করতে হবে।
- কীবোর্ডের Enter বোতামে চাপ দিলে ছবিটির ছাঁটাই করার কাজ সম্পন্ন হবে এবং ছবিটি সোজাভাবে স্থাপিত হবে।

ইরেজার টুল-এর ব্যবহার

- ইরেজার টুল দিয়ে যখন কোন রং মুছে ফেলা হয় তখন ঐ রংটি আসলে ক্যানভাসের রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ক্যানভাসের রং সাদা হলে মনে হবে রংটা মুছে যাচ্ছে। ক্যানভাসের রং সাদা ছাড়া অন্য কোনো রং হলে বিষয়টি বোঝা যাবে। তবে, স্বচ্ছ (Transparent) লেয়ারের ছবি ইরেজার টুল দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে মুছে ফেলা যাবে।
- সূক্ষ্ম অংশ মোছার জন্য কীবোর্ডের CAPS LOCK চেপে দিলে ইরেজার টুল যোগ চিহ্নের (+) আকার ধারণ করে। তখন সূক্ষ্ম অংশ মোছার কাজ করা যায়।
- ইরেজার টুলের অপশন বার-এর মোড ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে ব্রাশ, পেন্সিল বা ব্লক সিলেক্ট করে মোছার কাজ করা যায়। ব্লক সিলেক্ট করলে রাবার ইরেজার ইলেক্ট্রনিক সংস্করণের মতো কাজ করে। অন্য টুলগুলো সিলেক্ট করলে ওই সব টুলের Opacity অপশন ব্যবহার করা যায়।

গ্রেডিয়েন্ট টুলের সাহায্যে ব্লেন্ড তৈরি করা

Gradient Tool-এর একই অবস্থানে পেইন্ট বাকেট টুল রয়েছে। গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলে অপশন বার-এ ৫ প্রকার গ্রেডিয়েন্ট তৈরির আইকন পাওয়া যাবে। যেমন- Linear Gradient, Radial Gradient, Angle Gradient, Reflected Gradient এবং Diamond Gradient.

একটি রং শুরু থেকে শেষের দিকে ক্রমে মিলিয়ে যাওয়াকেই ব্লেন্ড বলা হয়। লিনিয়ার ব্লেন্ডে রং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, রেডিয়াল ব্লেন্ডে রং শুরুর স্থান থেকে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায় বা চতুর্দিকের গাঢ় রং কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে হতে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায়।

গ্রেডিয়েন্ট টুলের সাহায্যে লিনিয়ার ব্লেন্ড তৈরি করার জন্য-

- আয়তকার মার্কি টুলের সাহায্যে তিন ইঞ্চি প্রস্থ ও দুই ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সিলেকশন তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।
- গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে মাউস ক্যানভাসে নিয়ে এলে যোগ চিহ্নে পরিণত হবে। যোগচিহ্ন পয়েন্টারটি সিলেকশনের বাম প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থানে ক্লিক করে ডান প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর মাউস পয়েন্টার থেকে আঙুলের চাপ তুলে নিতে হবে। দেখা যাবে সিলেকশনটি কালো রং থেকে শুরু হয়ে শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে গেছে।

- ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে, উপর নিচে এবং নিচ থেকে উপরের দিকে এবং কোণাকুণি টেনেও ব্লেন্ড তৈরি করা যায়। পর্দায় কোনো কিছু সিলেক্ট করা না থাকলে সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে ব্লেন্ড তৈরি হয়ে যাবে।
- রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করার জন্য অপশন বার-এ রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট আইকনে ক্লিক করে সক্রিয় করে নিতে হবে।
- মাউস ক্যানভাসে নিয়ে এলে যোগ চিহ্নে পরিণত হবে। যোগ চিহ্ন পয়েন্টারটি সিলেকশনের মাঝামাঝি অবস্থানে ক্লিক করে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর মাউস পয়েন্টার থেকে আঙুলের চাপ তুলে নিতে হবে।

গ্রেডিয়েন্ট সম্পাদনা

Gradient Editor ডায়ালগ বক্সে শুরু, শেষ এবং মধ্যবর্তী রং পরিবর্তন/সমন্বয় করে গ্রেডিয়েন্ট সম্পাদনার কাজ করতে হয়। এ জন্য-

- গ্রেডিয়েন্ট বার-এ ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট এডিটর ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- গ্রেডিয়েন্ট এডিটর ডায়ালগ বক্সের গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের বাম প্রান্তে নিচে এবং ডান প্রান্তের নিচে Color Stop ত্রিকোণ এবং বাম প্রান্তের উপরে ও ডান প্রান্তের উপরে রয়েছে Opacity Stop ত্রিকোণ। ধরা যাক, একটি লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টের শুরুর রং হচ্ছে লাল এবং শেষের রং হচ্ছে হলুদ। এ ক্ষেত্রে লাল রঙের পরিবর্তে নীল রং ব্যবহার করার জন্য-
- গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের বাম প্রান্তের Color Stop ত্রিকোণে ক্লিক করলে নিচে Stops এলাকায় Color সোয়াচ সক্রিয় হবে। কালার সোয়াচে ক্লিক করলে Select stop color ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে নীল রং সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং গ্রেডিয়েন্ট বার-এর বাম প্রান্তের স্টপ কালার বা রং হিসেবে নীল যুক্ত হবে। এবার, গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ড্র্যাগ করলে নীল এবং হলুদ রঙের সমন্বয়ে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে।
- কালার স্টপ সিলেক্ট করলে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের নিচের দিকে এবং ওপাসিটি স্টপ সিলেক্ট করলে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের উপরের দিকে মাঝখানে একটি ডায়মন্ড আকৃতির আইকন দেখা যাবে। এই আইকনটি গ্রেডিয়েন্টের মধ্যবিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে। মধ্যবিন্দু থেকে রঙ মিলিয়ে যাওয়া শুরু হয়। মধ্যবিন্দু আইকন সিলেক্ট করার পর অবস্থান বা লোকেশন ঘরে অবস্থানের স্থান–নির্ধারণীসূচক সংখ্যা টাইপ করে মধ্যবিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। আইকনটি ডানে-বাঁয়ে ড্র্যাগ করেও মধ্যবিন্দুর অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।

নতুন রঙ ও কালার স্টপস যুক্ত করা ও বাতিল করা

গ্রেডিয়েন্টের জন্য দুটির বেশি রং ব্যবহার করতে হলে স্লাইডারে নতুন কালার স্টপ যোগ করতে হবে। এ জন্য –

- স্লাইডারের নিচে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করলে পাশের কালারের সঙ্গে রঙমিশ্রণের মধ্যবিন্দু নির্ধারক ডায়মন্ডসহ ক্লিক করা অবস্থানে নতুন কালার স্টপ যুক্ত হবে। একই নিয়মে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কালার স্টপ যোগ করা যাবে।
- অতিরিক্ত কালার স্টপ বাতিল করা বা ফেলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কালার স্টপ আইকনে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে স্লাইডারের বাহিরে এনে ছেড়ে দিলে কালার স্টপটি বাতিল হয়ে যাবে।

ছবির ঔজ্জ্বল্য ও কন্ট্রাস্ট সমন্বয় করা

স্ক্যান করা ছবি অথবা ক্যামেরায় তোলা ছবি অনুজ্জ্বল হতে পারে। সাদা-কালো বা রঙের দৃশ্যমানতা আশানুরূপ নাও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ছবির ঔজ্জ্বল্য শাণিত করা এবং কন্ট্রাস্ট সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। ছবির ঔজ্জ্বল্য বা কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য-

- Image মেনুর Adjustments কমান্ড সিলেক্ট করে প্রাপ্ত সাব-মেনু থেকে Brightness/Contrast সিলেক্ট করলে সংশ্লিষ্ট ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- ডায়লগ বক্সের ব্রাইটনেস/কন্ট্রাস্ট স্লাইডারের ত্রিকোণ ডানে/বাঁয়ে সরিয়ে ছবির ঔজ্জ্বল্য এবং কন্ট্রাস্ট বাড়ানো/ কমানোর কাজ করতে হবে।
- ডায়লগ বক্সে আসার আগে ছবির কোনো অংশ সিলেক্ট করে নিলে শুধু ওই অংশের ঔজ্জ্বল্য এবং কন্ট্রাস্ট বাড়ানো/ কমানোর কাজ করা যাবে।

ডায়ালগ বক্সের Preview চেক বক্সে ক্লিক করে সক্রিয় করে রাখলে ছবির রঙ পরিবর্তনের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করা যাবে। পরিবর্তিত রূপ সন্তোষজনক মনে না হলে কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রাখলে ডায়ালগ বক্সের Cancel বোতামটি Reset বোতামে পরিণত হবে। Alt বোতাম চেপে রাখা অবস্থাতেই Reset বোতামে ক্লিক করলে এ-যাবৎ করা কাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ নিয়ম Adjustments কমান্ডের মেনুর অধীন সবগুলো ডায়ালগ বক্সের জন্যই প্রযোজ্য।

ইলাস্ট্রেটর

এডোবি ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে মূলত ছবি আঁকা, নকশা প্রণয়ন করা, লোগো তৈরি করা এবং অন্যান্য ডিজাইন তৈরি করার প্রোগ্রাম। এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামের সাহায্যে যেমন ডিজাইনের কাজ করার সুযোগ খুবই সীমিত, তেমনি এডোবি ইলাস্ট্রেটরে ছবি সম্পাদনার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। ইলাস্ট্রেটরের প্রধান কাজই হচ্ছে অঙ্কন শিল্পের কাজ।

আমাদের দেশে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশনার প্রচ্ছদ তৈরি করার জন্য শিল্পীরা এখন রঙ-তুলির ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন বললেই চলে। এডোবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করেই এখন তাঁরা প্রচ্ছদ তৈরির কাজ করে থাকেন। আমন্ত্রণপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছোট-বড় কাজসহ বিভিন্ন আকারের পোস্টার, বিশাল আকারের ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরির কাজ এখন ইলাস্ট্রেটর ছাড়া ভাবাই যায় না।

কম্পিউটার ব্যবহার করে ডিজাইনের কাজ করার জন্য আরও অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে। কিন্তু, কাজের সুবিধা এবং বৈচিত্র্যের জন্য ইলাস্ট্রেটরের চাহিদা বেশি। এসব কারণে, ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়।

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামে ইংরেজি ও বাংলা লেখালেখির জন্য কম্পিউটারের কীবোর্ড ব্যবহার করা ছাড়াও শিল্পীর তুলি দিয়ে লেখার মতো করেও লেখালেখির কাজ করা যায়। লেখার পরে অক্ষর বা অক্ষরসমূহের আকার এবং আকৃতি যেভাবে ইচ্ছা বা প্রয়োজন সে ভাবেই পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

অন্যান্য প্রোগ্রামের মতোই ইলাস্ট্রেটরে কাজ করার জন্য ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামটি খুলে নিতে হয় এবং নতুন ফাইল তৈরি করে কাজ শুরু করতে হয়।

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলা

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলার জন্য-

১. পর্দার নিচের দিকে বাম কোণে স্টার্ট (Start) বোতামের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু বা তালিকা আসবে।

২. এ মেনুর অল প্রোগ্রামস (All Programs) কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

৩. এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে এডোবি মাস্টার কালেকশন (Adobe Master Collection) মেনুতে ক্লিক করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু আসবে। এ মেনুতে এডোবির প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৪. এ তালিকা থেকে এডোবি ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামের নামের উপর ক্লিক করলে এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator) প্রোগ্রাম খুলে যাবে।

ইলাস্ট্রেটরে নতুন ফাইল খোলার জন্য-

- File মেনু থেকে New কমান্ড দিলে অথবা কীবোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে N বোতামে চাপ দিলে New ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে ফাইলের জন্য একটি নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, Ankon-1. এ ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। যে ধরনের নাম মনে রাখতে সুবিধা হয় বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে ধরনের যেকোনো নাম রাখা যেতে পারে। এতে পরবর্তী পর্যায়ে ফাইলটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

- Size ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিস্তৃত ড্রপ-ডাউন তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকায় কাগজের বিভিন্ন মাপসূচক পরিচিতি পাওয়া যাবে। এর ভেতর থেকে যে মাপের কাগজে কাজ করা প্রয়োজন সেই মাপের নামে সিলেক্ট করলে দৈর্ঘ্য (Height) ও প্রস্থ (Width) ঘরে ওই কাগজের প্রকৃত মাপ দেখা যাবে।
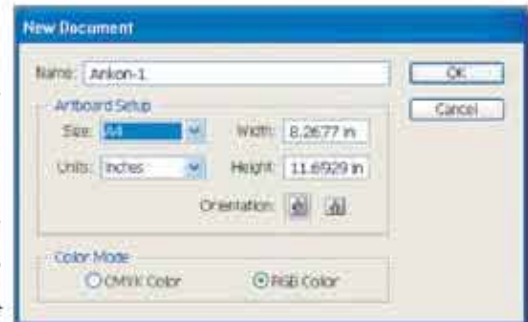
- Units ঘরে বিভিন্ন মাপের একক রয়েছে। আমাদের দেশের ব্যবহারকারীরা ইঞ্চির (Inches) মাপে কাজ করে অভ্যস্ত। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মাপে কাজ করার জন্য পয়েন্ট (Points), পাইকা (Picas), মিলিমিটার (Millimeters), সেন্টিমিটার (Centimeters), পিক্সেল (Pixel) ইত্যাদি মাপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ইউনিট (Units) ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিস্তৃত ড্রপ-ডাউন তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী মাপের একক নির্ধারণ করে নিতে হবে।
- Orientation-এর ডান দিকে দুটি মানুষের চিত্র রয়েছে। প্রথমটিতে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে কাগজ খাড়াখাড়ি (Portrait) অবস্থায় থাকবে। দ্বিতীয়টিতে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে কাগজ আড়াআড়ি (Landscape) অবস্থায় থাকবে।
- Color Mode অংশে RGB এবং CMYK নামে দুটি অপশন পাওয়া যাবে। মুদ্রণের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য CMYK মোডে কাজ করাই ভালো। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য RGB মোড ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের পর্দায় এ দুটি মোডের পার্থক্য অবশ্য তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না।
- এ সব মাপজোক ঠিক করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্সটি চলে যাবে এবং কাজ করার জন্য নতুন একটি উইন্ডো পাওয়া যাবে।

New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে ফাইলের জন্য কোনো নাম টাইপ করা হলে মেনু বার-এর উপরে টাইটেল বার-এ এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator)-এর ডান দিকে ওই নাম দেখা যাবে। New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে কোনো নাম টাইপ করা না হলে টাইটেল বার-এ এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator)-এর ডান দিকে আনটাইটেলড (Untitled ....) লেখা থাকবে।

কাজের পরিবেশ পরিচিতি

নতুন ফাইল তৈরির করার পর পর্দায় নতুন শূন্য ফাইল পাওয়া যাবে। ফাইল খোলার পর কাজ শুরু করার জন্য পর্দায় বিভিন্ন প্রকার উপকরণ বিদ্যমান থাকে। যেমন- মেনু বার, টুলবক্স, ভাসমান প্যালেট (Floating Palette) স্ক্রলবার ইত্যাদি।

টাইটেল বার

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলার পর পর্দায় একেবারে উপরে বাম পাশে টাইটেল বার-এ অ্যাপ্লিকেশনের নামের সঙ্গে ডকুমেন্টের অন্যান্য তথ্য থাকতে পারে এ রকম- Adobe Illustrator-[Ankon-1 @ 70 (RGB/Preview)]। এখানে Adobe Illustrator হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের নাম, Ankon-1 হচ্ছে ফাইলের নাম, যদি ফাইল তৈরির সময় দেওয়া হয়, @ 70 (CMYK/Preview) হচ্ছে পর্দার দৃশ্যমান এলাকার আকার এবং ব্যবহৃত কালার মোডের পরিচিতি। এই লেখাগুলোর বরাবর ডান দিকে চলে যাওয়া পুরো অংশটি হচ্ছে টাইটেল বার।
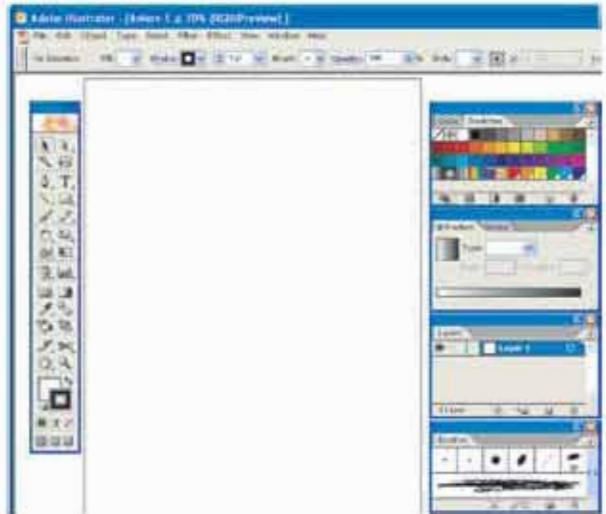
- নতুন ফাইল খোলার সময় কোনো নাম ব্যবহার করা না হলে পরবর্তীতে অন্য কোনো নাম দিয়ে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। ফাইলগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করার পর যখন যে নামের ফাইল নিয়ে কাজ করা হয় তখন সেই ফাইলটির নাম টাইটেল বার-এ অ্যাপ্লিকেশনের নামের ডান দিকে প্রদর্শিত হয়।

Toolbox & Palette-এ থাকে ডিজাইন-ড্রয়িংয়ের বিভিন্ন প্রকার টুল ও অপশন। এসব টুল ও অপশন ব্যবহার ও প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার ডিজাইন ড্রয়িংয়ের কাজ করা হয় এবং কাজকে প্রত্যাশিত রূপ দেওয়ার জন্য নানা রকম সম্পাদনার কাজ করতে হয়।

টুলবক্সের প্রয়োজনীয় টুলসমূহের পরিচিতি

কাজের শুরুতে টুলবক্সের প্রয়োজনীয় কিছু টুলের নাম জেনে নেওয়া যেতে পারে।

টুলবক্সে এলিপস, পলিগোন, স্টার এবং স্পাইরাল টুলগুলো একই অবস্থানে থাকে। এ রকম একই অবস্থানে একাধিক টুলের অবস্থানকে বলা হয় গ্রুপ টুল। এ সব টুলের সঙ্গে ডানমুখী ত্রিকোণ রয়েছে। টুলের সঙ্গে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে একই অবস্থানে আরও টুল রয়েছে। টুলবক্সে দৃশ্যমান টুলটিতে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে সবগুলো টুল একসঙ্গে দেখা যায়। যে টুলটি ব্যবহার করা প্রয়োজন মাউস পয়েন্টার ড্র্যাগ করে সেই টুলটিতে ক্লিক করলে ওই টুলটি টুল বক্সে দৃশ্যমান থাকে।

টুলবক্সের টুলগুলোর নিচের সোয়াচে (Swatch) কয়েকটি আইকন রয়েছে। এ আইকনগুলোর সাহায্যে অবজেক্ট এবং অবজেক্টের প্রান্তে রঙ প্রয়োগ করা হয়, রঙ বাতিল করে দেওয়া হয়। আইকনগুলোর ব্যবহার বোঝার সুবিধার্থে একটি অবজেক্ট তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। এরূপ একটি অবজেক্ট তৈরির জন্য–

- মাউস পয়েন্টার দিয়ে রেক্টেঙ্গোল টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করে নিচের দিকে ডান কোনাকুনি এক ইঞ্চির মতো ড্র্যাগ করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে একটি আয়তাকার বা চতুর্ভুজ অবজেক্ট তৈরি হবে।
- অবজেক্টটি সিলেক্টড থাকবে এবং কোনো একটি রঙ দ্বারা পূরণ (Fill) করা অবস্থায় থাকতে পারে।
- সিলেক্টেড অবজেক্টের চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ফাঁপা বক্স থাকবে। এ অবস্থায় চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্স দৃশ্যমান হবে।

- কোনো কারণে অবজেক্টটি সিলেকশনমুক্ত হয়ে গেলে মাউস পয়েন্টার দিয়ে টুলবক্সে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট হবে। এবার মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে অবজেক্টটি সিলেক্টেড হবে। এ অবস্থায় আবার সিলেকশন টুলে ক্লিক করলে চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্সসহ চার বাহুতে আরো চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্স দৃশ্যমান হবে।
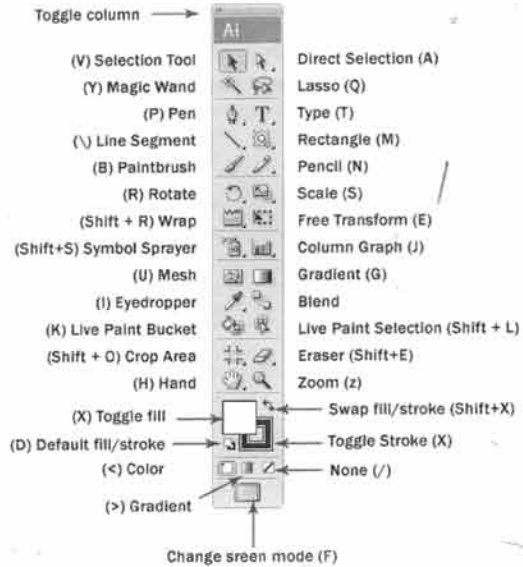
অবজেক্টে রঙ প্রয়োগ করা

ফিল ও স্ট্রোক

- একটি অবজেক্টের প্রান্ত বা বর্ডারকে বলা হয় স্ট্রোক এবং ভেতরের অংশকে বলা হয় ফিল। ফিল ও স্ট্রোক সোয়াচের ব্যবহার কালার প্যালেটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কালার প্যালেটটি পর্দায় বিদ্যমান না থাকলে উইন্ডো (Window) মেনু থেকে কালার (Color) কমান্ড দিলে বা কীবোর্ডের F6 বোতামে চাপ দিলে কালার প্যালেটটি পর্দায় উপস্থাপিত হবে। ফিল সোয়াচে ক্লিক করলে ফিল সোয়াচটি সক্রিয় হবে এবং উপরে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় শুধু ফিল (Fill)-এর কাজ করা যাবে। কোনো অবজেক্টকে রং দিয়ে পূরণ করা যাবে। স্ট্রোকে রঙ প্রয়োগ করা যাবে না। একই রকমভাবে স্ট্রোক সোয়াচে ক্লিক করলে স্ট্রোক সোয়াচটি সক্রিয় হবে এবং ফিল সোয়াচ উপরে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় অবজেক্টের স্ট্রোকে রং প্রয়োগ করা যাবে। অবজেক্টকে রং দিয়ে পূরণ করা বা ফিল (Fill)-এর কাজ করা যাবে না।
- ফিল (Fill) সোয়াচটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় কালার প্যালেটের কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে সিলেক্টেড অবজেক্টটির ভেতরের অংশে সেই রঙে পূরণ হয়ে যাবে। আবার স্ট্রোক (Stroke) সোয়াচটিতে ক্লিক করে সক্রিয় করার পর কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে অবজেক্টের স্ট্রোক বা প্রান্তরেখা সেই রঙে পূরণ হয়ে যাবে। এতে অবজেক্টের ভেতরের রং পরিবর্তিত হবে না।
- স্ট্রোকের রং স্পষ্টভাবে দেখা বা বোঝার জন্য স্ট্রোককে মোটা করে নেওয়া যেতে পারে। এ জন্য উইন্ডো (Window) মেনু থেকে স্ট্রোক (Stroke) কমান্ড সিলেক্ট করলে পর্দায় স্ট্রোক প্যালেট উপস্থাপিত হবে। স্ট্রোক প্যালেটের ওয়েট ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে আপাতত কমপক্ষে ১০ সিলেক্ট করতে হবে। এতে অবজেক্টের বর্ডার বা স্ট্রোক আগের চেয়ে মোটা হবে। এ পর্যায়ে রং প্রয়োগ ও পরিবর্তন করলে স্পষ্ট দেখা যাবে বা বোঝা যাবে।

কালার, গ্রেডিয়েন্ট ও নান [Color (,) Gradient (.) None (/)]

ফিল ও স্ট্রোক সোয়াচের নিচের সারির ৩টি আইকন হচ্ছে যথাক্রমে কালার, গ্রেডিয়েন্ট ও নান। কালার আইকন ক্লিক করলে রঙের প্যালেট এবং গ্রেডিয়েন্ট আইকন ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট প্যালেট সক্রিয় হয়। নান আইকন ক্লিক করলে সিলেক্টেড অবজেক্টের ফিল বা স্ট্রোকের রং নিষ্ক্রিয় বা বাতিল হয়ে যায়। অবজেক্টটি কোনো রং বা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে পূরণ করা হয়ে থাকলে প্যালেটে সেই রংও প্রদর্শিত হবে। অবজেক্টটি সিলেক্টেড থাকলে অবজেক্টের রংও পরিবর্তিত হবে।
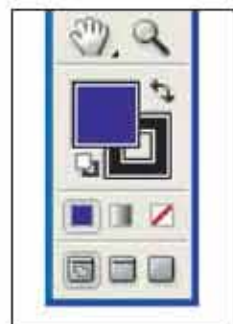
অবজেক্ট ছোট/বড় করে দেখা

অবজেক্ট তৈরির জন্য অনেক সময় অনেক সূক্ষ্ম কাজ করতে হয়। অবজেক্টের স্বাভাবিক মাপে বা অবস্থায় সূক্ষ্ম কাজ করতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য অবজেক্টের নির্দিষ্ট একটি অংশকে বড় করে দেখা গেলে কাজের সুবিধা হয়। ইলাস্ট্রেটরে কাজ করার সময় পৃষ্ঠা বড় করে দেখাকে বলা হয় জুম ইন (Zoom In) এবং পৃষ্ঠা ছোট করে দেখাকে বলা হয় জুম আউট (Zoom Out)। পৃষ্ঠা ছোট/বড় করার সঙ্গে সঙ্গে অবজেক্টও ছোট/বড় দেখা যায়।

অবজেক্ট ছোট-বড় করে দেখার জন্য জুম টুল (Zoom Tool)-এর সাহায্যে পৃষ্ঠার দৃশ্যমান রূপ ছোট/বড় করে দেখতে হবে। এ জন্য –

- টুলবক্সে জুম টুলে ক্লিক করলে জুম টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- জুম টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার উপরে নিয়ে এলে মাউস পয়েন্টার আতশি কাঁচের মতো দেখাবে এবং কাঁচের ভেতরে একটি যোগ চিহ্ন থাকবে।
- জুম টুল দিয়ে পর্দার উপর ক্লিক করলে পর্দার আকার বড় হবে। পর্দার আকার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবজেক্টও বেশি বড় না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত রূপে পর্দার মধ্যেই অবস্থান করবে। বেশি বড় হয়ে গেলে অবজেক্টের কোনো অংশ নাও দেখা যেতে পারে। এ অবস্থায় হ্যান্ড টুলের সাহায্যে পর্দার উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ওই অংশ পর্দার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
- জুম টুল সক্রিয় থাকা অবস্থায় কীবোর্ডের অল্টার Alt বোতামে চাপ দিলে জুম টুলটি জুম আউট (Zoom Out) টুলে পরিণত হবে। কীবোর্ডের অল্টার Alt বোতামে চেপে রেখে জুম আউট (Zoom Out) টুল দিয়ে ক্লিক করতে থাকলে পর্দার আকার ছোট হয়ে আসতে থাকবে।
- কীবোর্ডের কন্ট্রোল Ctrl বোতাম চেপে রেখে হাইফেন (-) বোতামে চাপ দিলে জুম আউট এবং সমান-(=) চিহ্নের বোতামে চাপ দিলে জুম ইন-এর কাজ সম্পন্ন হবে।

হ্যান্ড টুলের সাহায্যে পৃষ্ঠা/অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তন

পৃষ্ঠার দৃশ্যমান রূপ ছোট/বড় করা হলে অবজেক্টের প্রয়োজনীয় কোনো অংশ দৃশ্যযোগ্য এলাকার বাইরে চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় অবজেক্টটি পর্দার যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে স্থাপন করার জন্য –

- টুল বক্সের হ্যান্ড টুলে ক্লিক করে হ্যান্ড টুল সিলেক্ট করতে হবে।
- হ্যান্ড টুলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অবজেক্টের উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে সুবিধাজনক স্থানে নেওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

এতে আসলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার অবস্থানই পরিবর্তিত হবে। ক্লিক করা অবজেক্টটি ভিন্নভাবে স্থানান্তরিত হবে না।

অবজেক্ট অবলোকনের পরিবেশ

ইলাস্ট্রেটরে অবজেক্ট অবলোকনের কয়েকটি মোড রয়েছে। View মেনু থেকে এর যেকোনো একটি প্রয়োজন অনুযায়ী সিলেক্ট করতে হবে।

- Outline মোডে বা পরিবেশে অবজেক্টকে শুধু আউটলাইন বা রেখা কাঠামো হিসেবে দেখা যায়। এ

পরিবেশে অবজেক্টের আকার-আকৃতি বা কাঠামো সম্পাদনার কাজ, বিশেষ করে রেখা বা পাথ সম্পাদনার সূক্ষ্ম কাজ করতে সুবিধা হয়।

- Pixel Preview বা Preview মোডে বা পরিবেশে অবজেক্ট প্রকৃতরূপে প্রদর্শিত হয়।
- Overprint Preview মোডে প্রদর্শিত রূপ মুদ্রিত হয়।

অবজেক্ট তৈরি করা

অবজেক্ট তৈরির প্রস্তুতি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি তৈরির প্রাথমিক কাজ করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন- বর্গাকার ও আয়তাকার আকৃতি তৈরি করা, বৃত্তাকার ও ডিম্বাকার আকৃতি তৈরি করা, বহুকোণ বিশিষ্ট আকৃতি, তারকার আকৃতি, পেঁচানো আকৃতি ইত্যাদি তৈরি করা। একটি অবজেক্ট তৈরির জন্য–

- মাউস পয়েন্টার দিয়ে, রেক্টেঙ্গেল টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করে নিচের দিকে ডান কোনাকুনি এক ইঞ্চির মতো ড্র্যাগ করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে একটি আয়তকার বা চতুর্ভুজ অবজেক্ট তৈরি হবে।

একই প্রক্রিয়ায় টুল বক্স থেকে অন্য যে কোনো অবজেক্ট টুল সিলেক্ট করে অন্যান্য অবজেক্ট তৈরির কাজ করতে হবে। কোনো অবজেক্টই সাধারণত একবারে তৈরি করা সম্ভব হয় না। বারবার অংশ বিশেষ মুছে বা পুরোটা মুছে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। এ জন্য অবজেক্ট সিলেক্ট করা এবং পুরো অবজেক্ট বা অবজেক্টের অংশবিশেষ মুছে ফেলার কাজ শিখে নেওয়া প্রয়োজন।

অবজেক্ট সিলেক্ট করা এবং অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা পাথ মুছে ফেলা

- অবজেক্টটি যদি রঙ দিয়ে পূরণ করা থাকে, তাহলে সিলেকশন টুল বা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টে ক্লিক করলে অবজেক্ট সিলেক্ট হবে। কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে প্রান্তরেখার (Path) উপর বা অবজেক্টের প্রান্তরেখার উপর ক্লিক করলে সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট হবে।
- অবজেক্টের প্রান্তরেখা (Path) বা রেখাংশ সিলেক্ট করা ও মুছে ফেলার জন্য সিলেকশন টুল বা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা রেখাংশ সিলেক্ট করতে হবে। এরপর, কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস (Backspace) বা ডিলিট (Delete) বোতামে চাপ দিলে অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা রেখাংশ মুছে যাবে।

ব্যাকস্পেস (Backspace) বা ডিলিট (Delete) বোতামে চাপ দিলে অবজেক্টটি একেবারে মুছে যায়। এডিট (Edit) মেনু থেকে কাট (Cut) কমান্ড সিলেক্ট করলে অবজেক্টটি ক্লিপবোর্ড নামক অস্থায়ী স্মৃতিতে চলে যায় এবং অন্য কোনো অবজেক্ট কাট বা কপি না করা পর্যন্ত ক্লিপবোর্ডে অবস্থান করে। কোনো অবজেক্ট ক্লিপবোর্ডে থাকা অবস্থায় এডিট (Edit) মেনু থেকে পেস্ট (Paste) কমান্ড সিলেক্ট করলে অবজেক্টটি আবার ডকুমেন্টে ফিরে পাওয়া যায়।

পাথ বা প্রান্তরেখা

অবজেক্টের প্রান্তরেখা মূলত একাধিক রেখাংশ বা সেগমেন্ট (Segment)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। বিশেষ প্রয়োজনে একটিমাত্র রেখাংশ বা সেগমেন্ট বিশিষ্ট রেখাও ব্যবহার করতে হয়। অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা বর্ডার রেখাকে বলা হয় পাথ (Path)। একটিমাত্র সরল রেখাকেও পাথ (Path) বলা হয়।

সিলেকশন টুল

- সম্পূর্ণ অবজেক্ট বা অবজেক্টের অংশবিশেষ সিলেক্ট করার জন্য সিলেকশন টুল, ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বা গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করতে হয়।
- সিলেকশন টুলকে কালো তীর (Black Arrow) বলেও উল্লেখ করা হয়। সিলেকশন টুল ব্যবহার করার জন্য মাউস পয়েন্টার দিয়ে সিলেকশন টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হয়। টুলটি সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার উপরে নিয়ে এলে মাউস পয়েন্টারটি কালো তীর বা সিলেকশন টুলের রূপ ধারণ করে। এ অবস্থায় সিলেকশন টুল (Selection Tool) দিয়ে অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট হয়। সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য।
- সিলেকশন টুল দিয়ে কোনো অবজেক্ট সিলেক্ট করলে অবজেক্টের চারদিকে আয়তাকার বা বৃত্তাকার বক্স বা বাউন্ডিং বক্স তৈরি হয়। বক্সের চার কোণে চারটি এবং চার বাহুতে চারটি ক্ষুদ্র ফাঁপা বক্স দেখা যায়। এ বক্সগুলোকে বলা হয় রিসাইজ বক্স (Resize Box)। রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অবজেক্টের আকার যেকোনো দিক থেকে ছোট-বড় করা যায়। কীবোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে ড্র্যাগ করলে অবজেক্ট আনুপাতিক হারে ছোট-বড় হবে।
- সিলেকশন টুলের সাহায্যে সিলেক্ট করা অবজেক্টের কেন্দ্রবিন্দুতে বা যে কোনো বাহুতে বা অবজেক্টের যে কোনো অংশে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অবজেক্টকে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে স্থাপন করা যাবে।

একসঙ্গে একাধিক অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য –

- প্রথম অবজেক্ট সিলেক্ট করার পর কীবোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে পরবর্তী অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হয়। এভাবে যতগুলো অবজেক্ট প্রয়োজন সিলেক্ট করা যাবে। সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় অবজেক্টগুলোর চারদিক দিয়ে একটিমাত্র বাউন্ডিং বক্স থাকবে।
- বাউন্ডিং বক্সের রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে সবগুলো অবজেক্ট একসঙ্গে ছোট-বড় করা যাবে।
- অবজেক্টকে সিলেকশনমুক্ত করার জন্য পর্দার যেকোনো ফাঁকা জায়গায় মাউস পয়েন্টার ক্লিক করতে হবে। একাধিক সিলেক্ট অবজেক্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্ট সিলেকশনমুক্ত করার জন্য শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে ওই অবজেক্টে ক্লিক করতে হবে।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল

সিলেকশন টুলের ডান পাশের সাদা টুলটি হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল (Direct Selection Tool)। এ টুলটিকে অনেকে সাদা তীর (White Arrow) বলেও অভিহিত করে থাকেন।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বা সাদা তীর ব্যবহার করা হয় অবজেক্টের পাথের অংশ বিশেষ (Segment) এবং সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের যেকোনো অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট সিলেক্ট করে অবজেক্টের অংশ বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে ছোট-বড় করা যায়।

অবজেক্ট গ্রুপ করা

অনেকগুলো বৃত্তাকার, ডিম্বাকার, বর্গাকার ও আয়তাকার অবজেক্ট তৈরি করার পর অবজেক্টগুলোর গ্রুপ তৈরির জন্য –

ক. সকল অবজেক্ট বা প্রয়োজনীয় অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করতে হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে গ্রুপ (Group) কমান্ড দিলে সিলেক্টেড অবজেক্টগুলো গ্রুপবন্ধ হয়ে যাবে।

পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করে সব অবজেক্ট সিলেকশনমুক্ত করার পর কালো তীর বা সিলেকশন টুল দিয়ে যেকোনো একটি অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে গ্রুপবন্ধ সব অবজেক্টের চারপাশ ঘিরে একটি আয়তাকার বাউন্ডিং বক্স তৈরি হবে। এতে বোঝা যাবে সিলেকশন বক্সের ভেতরের অবজেক্টগুলো একই সঙ্গে সিলেক্ট হয়েছে।

গ্রুপবন্ধ অবজেক্টগুলো গ্রুপমুক্ত করার জন্য –

ক. যে কোনো অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে গ্রুপবন্ধ অবজেক্টগুলো সিলেক্ট হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে আনগ্রুপ (Ungroup) কমান্ড দিলে গ্রুপবন্ধ অবজেক্টগুলো গ্রুপমুক্ত হয়ে যাবে।

অবজেক্ট লক করা

একাধিক অবজেক্ট নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনো একটি বা একাধিক অবজেক্ট লক (Lock) করে রাখতে হয়। লক করা অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায় না। কাজেই, ওই অবজেক্ট সম্পাদনা করা যায় না। ফলে, লক করা অবজেক্ট অসতর্কতার কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

অবজেক্ট লক করার জন্য –

ক. নির্দিষ্ট অবজেক্টটি সিলেক্ট করতে হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে লক (Lock) কমান্ড দিতে হবে।

কাজ করার কোনো পর্যায়ে লক করা অবজেক্ট পুনরায় সম্পাদনা বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে অবজেক্টটি লকমুক্ত বা আনলক (Unlock) করে নিতে হয়। অবজেক্ট আনলক করার জন্য –

অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে আনলক অল (Unlock All) কমান্ড দিতে হবে। এতে লক করা সকল অবজেক্ট লকমুক্ত বা আনলক হয়ে যাবে। লকমুক্ত বা আনলক করা অবজেক্ট স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদনা করা যাবে।

কাট, কপি, পেস্ট কমান্ডের ব্যবহার

সিলেকশন টুলের সাহায্যে কোনো অবজেক্ট সিলেক্ট করার পর এডিট মেনুর কাট (Cut) কমান্ড দিলে অবজেক্টটি কাট হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কপি (Copy) কমান্ড দিলে অবজেক্টটি কপি হয়। কাট ও কপি করা কোনো অবজেক্ট কম্পিউটারের ক্লিপবোর্ডে জমা থাকে। অতঃপর এডিট মেনু থেকে পেস্ট (Paste) কমান্ড প্রদান করলে এ অবজেক্ট পর্দায় পেস্ট হয় বা স্থাপিত হয়। অতঃপর সিলেকশন টুলের সাহায্যে ড্র্যাগ করে পেস্ট করা অবজেক্ট প্রয়োজনীয় স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যায়।

কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে কোনো অবজেক্ট ড্র্যাগ করলে ওই অবজেক্টের হুবহু কপি তৈরি হয়ে স্থানান্তরিত হয়।

এডিট মেনুর Paste In Front কমান্ড দিলে কপি করা অবজেক্ট উক্ত অবজেক্টের ঠিক উপর স্থাপিত হয়। এডিট মেনুর Paste In Back কমান্ড দিলে কপি করা কোনো অবজেক্ট উক্ত অবজেক্টের ঠিক পিছনে স্থাপিত হয়।

লেয়ার

Layer শব্দের বাংলা হতে পারে স্তর। লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবজেক্ট ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রেখে কাজ করা যায়। এই স্তর বা লেয়ারকে স্বচ্ছ কাচ, পলিথিন ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনটি কাচের উপর বা অন্যান্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তিনটি অবজেক্ট বা ছবি তৈরি করে একটির উপর একটি স্থাপন করলে ৩টি অবজেক্ট বা ছবিই দেখা যাবে। এই ৩টি কাচ বা মাধ্যমকে ৩টি লেয়ার হিসেবে ধরা যেতে পারে।

লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করার সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– লেয়ারসমূহের মধ্যে স্তর বিন্যাস পরিবর্তন করা, কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক অবজেক্ট অদৃশ্য করে রাখা, কাজের সুবিধার্থে লেয়ার লক করে রাখা, নতুন লেয়ার যোগ করা এবং অপ্রয়োজনীয় লেয়ার বাতিল করা ইত্যাদি।

নতুন লেয়ার তৈরি করা

পর্দায় লেয়ার প্যালেট দেখা না গেলে Window মেনু থেকে Layers কমান্ড দিলে পর্দায় লেয়ার প্যালেট উপস্থাপিত হবে। শুরুতে লেয়ার প্যালেটে একটিমাত্র লেয়ার থাকবে। একটি লেয়ারের কাজ শেষে অন্য লেয়ারে নতুন অবজেক্ট তৈরির জন্য লেয়ার প্যালেটে নতুন লেয়ার যোগ করে নিতে হবে। নতুন লেয়ার যোগ করার জন্য –

ক. লেয়ার প্যালেটের নিচের সারিতে Create New layer আইকন ক্লিক করলে লেয়ার প্যালেটে একটি নতুন লেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত লেয়ারকে নির্দিষ্ট কোনো নামে চিহ্নিত করার জন্য লেয়ারটির উপর ডবল ক্লিক করলে লেয়ার অপশনস (Layer Options) নামে একটি ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়ালগ বক্সের নেম (Name) ঘরে প্রয়োজনীয় নাম টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট লেয়ারটির ক্রমিক সংখ্যা বা নাম (যদি পূর্বে দেওয়া হয়ে থাকে) ডায়ালগ বক্সে টাইপ করা নামে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

লেয়ার বাতিল করা

ক. লেয়ারটি সিলেক্ট করে লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে ডিলিট (Delete) কমান্ড সিলেক্ট করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে।

- আর্টওয়ার্ক বা অবজেক্ট বিশিষ্ট লেয়ার বাতিল করার প্রক্রিয়ায় একটি সতর্কতাসূচক বার্তা প্রদর্শিত হবে "লেয়ারটি বাতিল করতে চান কি-না।" OK বোতামে ক্লিক করলে লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে এবং NO বোতামে ক্লিক করলে বাতিল প্রক্রিয়া রদ হয়ে যাবে। তবে, লেয়ারটিতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ডিলিট (Delete) আইকনের উপর ছেড়ে দিলে এরূপ বার্তা আসবে না।

লেয়ার একীভূত করা

দুটি বা আরো বেশি সংখ্যক লেয়ারের অবজেক্ট তৈরি ও সম্পাদনার কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ওই লেয়ারগুলো একীভূত করে নেওয়া যেতে পারে। লেয়ার একীভূত করার জন্য –

ক. সংশ্লিষ্ট লেয়ারগুলো সিলেক্ট করে নিতে হবে।

খ. লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে Merge Selected কমান্ড সিলেক্ট করলে লেয়ারগুলো একীভূত (Merge) হয়ে যাবে।

অবজেক্টে রঙের ব্যবহার

অবজেক্ট তৈরির পর প্রয়োজন অনুযায়ী রং প্রয়োগ করতে হয়। অবজেক্টে রং প্রয়োগ করার জন্য কালার প্যালেট, কালার বার বা কালার স্পেকট্রাম বার, গ্রেডিয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

কালার প্যালেট

পর্দায় কালার প্যালেট দেখা না গেলে উইন্ডো (Window) মেনুর কালার (Color) কমান্ড দিলে পর্দায় কালার প্যালেট উপস্থাপিত হবে।

- কালার প্যালেটের বাম পাশের উপরের দিকে রয়েছে ফিল ও স্ট্রোক নির্দেশক Indicator বক্স বা Swatch। এর নিচেই রয়েছে কালার স্লাইডার (Color Slider) এবং তার নিচে কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)। Grayscale রঙের মডেলে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ১টি, RGB = Red Green Blue মোডে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ৩টি এবং CMYK= Cyan Magenta Yellow Black মোডে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ৪টি।
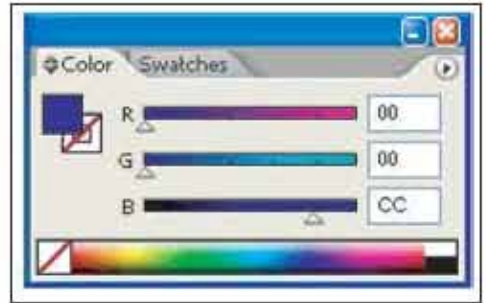
রং প্রয়োগ করা

কোনো অবজেক্টে রং প্রয়োগ করার জন্য –

ক. অবজেক্টটি সিলেক্ট করতে হবে।

খ. কালার প্যালেটের ফিল (Fill) নির্দেশক বক্সে ক্লিক করে সক্রিয় করলে ফিল সোয়াচটি সক্রিয় হবে। সক্রিয় ফিল সোয়াচটি স্ট্রোক আইকনের উপরে অবস্থান করবে।
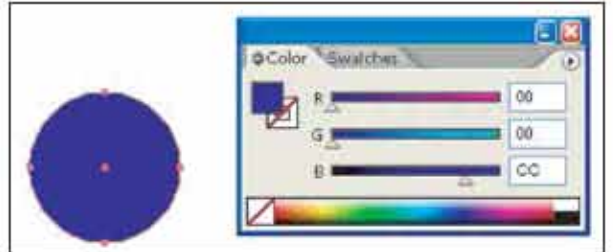
গ. কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ প্রয়োজনীয় রঙের উপর ক্লিক করতে হবে। সিলেক্টড অবজেক্টটি কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ ক্লিক করা রঙে পূরণ (Fill) হবে। কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এর একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছে সম্পূর্ণ সাদা এবং সম্পূর্ণ কালো রঙের সোয়াচ। কালো সোয়াচে ক্লিক করলে অবজেক্ট সম্পূর্ণ কালো রঙে এবং সাদা সোয়াচে ক্লিক করলে অবজেক্ট সম্পূর্ণ সাদা রঙে পূরণ (Fill) হবে।

স্ট্রোকের ব্যবহার

অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা লাইন বা বর্ডারকে বলা হয় পাথ। পাথ বা রেখা মোটা-চিকন করার পরিমাপককে স্ট্রোক (Stroke) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বদ্ধপাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট এবং মুক্ত পাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট, সরল এবং আঁকাবাঁকা লাইন ইত্যাদি সব ধরনের রেখাতেই স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা যায়। স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হচ্ছে রেখাকে মোটা-চিকন করা এবং রঙ প্রয়োগ করা।

স্ট্রোক মোটা-চিকন করার কাজ করতে হয় স্ট্রোক (Stroke) প্যালেটের সাহায্যে। এ জন্য-

ক. অবজেক্ট বা পাথ সিলেক্ট করতে হবে। পর্দায় যদি স্ট্রোক প্যালেট না থাকে তাহলে উইন্ডো (Window) মেনু থেকে স্ট্রোক (Stroke) কমান্ড দিলে পর্দায় স্ট্রোক প্যালেট পাওয়া যাবে।

খ. অবজেক্ট বা রেখা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় স্ট্রোক প্যালেটের ওয়েট (Weight) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনুর নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে ড্রপ-ডাউন তালিকায় অনেক মাপসূচক সংখ্যা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সংখ্যা সিলেক্ট করতে হবে। ছোট সংখ্যা সিলেক্ট করলে রেখা চিকন হবে, বড় সংখ্যা সিলেক্ট করলে রেখা মোটা হবে।

গ. প্রয়োজন হলে ওয়েট (Weight) ঘরে সরাসরি মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করা যায়। দশমিকযুক্ত সংখ্যাও ব্যবহার করা যায়। রেখার সরু বা মোটার পরিমাপ নির্ধারণের জন্য শূন্য (০) থেকে ১০০০ পয়েন্ট পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

পেন ও পেন্সিল টুল

ইলাস্ট্রেটর জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পেন টুল (PenTool)-এর ব্যবহার। পেন টুলের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও জটিল ডিজাইন তৈরি করা যায় এবং সম্পাদনার কাজ করা যায়।

একটি সরল পাথ বা রেখার দুই প্রান্তে দুটি অ্যাংকর পয়েন্ট থাকে। প্রথম অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টকে সূচনা পয়েন্ট (Starting Point) এবং দ্বিতীয় অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টকে সমাপ্তি পয়েন্ট (End Point) বলা হয়।
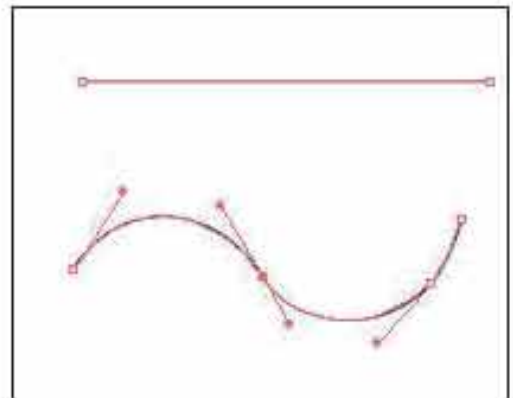
বক্রপাথ বা বক্ররেখা (Curve Path)-এর অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টগুলোর সঙ্গে কন্ট্রোল হ্যান্ডেল (Control Handle) এবং কন্ট্রোল হ্যান্ডেলের বাইরের প্রান্তে কন্ট্রোল পয়েন্ট থাকে (Control Point) থাকে। কন্ট্রোল হ্যান্ডেলের বাইরের প্রান্তে বা মাথায় অবস্থিত কন্ট্রোল পয়েন্ট (Control Point)-এ ক্লিক ও ড্র্যাগ করে রেখার বক্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট, কন্ট্রোল হ্যান্ডেল এবং কন্ট্রোল পয়েন্ট কোনোটিই মুদ্রণে আসে না।

পেন্সিল টুল আসলে পেন টুলেরই আর এক রূপ। পেন্সিল টুল (Pencil Tool)-এর সাহায্যে একবারে টেনে আঁকাবাঁকা লাইন বা পাথ তৈরি করা যায়।

পেন টুল হচ্ছে ভেক্টর অবজেক্ট তৈরির প্রধানতম টুল। পেন টুলের সাহায্যে যেকোনো আকৃতির সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পাথের সাহায্যে নিখুঁত অবজেক্ট তৈরি করা যায়।

বন্ধ পাথ ও খোলা বা মুক্ত পাথ

বন্ধ পাথের শুরু ও শেষ বলে কিছু থাকে না। যেমন- বৃত্ত, বর্গ ইত্যাদি। বন্ধ পাথ (Close Path) আঁকাবাঁকা প্রান্ত বিশিষ্টও হতে পারে। পক্ষান্তরে, খোলা বা মুক্ত পাথ (Open Path)-এর শুরুর প্রান্ত এবং শেষের প্রান্ত থাকে।

পেন্সিল টুল ও পেন টুল

পেন্সিল টুলের সাহায্যে সবচেয়ে সহজ উপায়ে পাথ তৈরি করা যায়। টুলবক্স থেকে পেন্সিল টুল সিলেক্ট করার পর পর্দায় ক্লিক ও ড্র্যাগ করে একটানা আঁকাবাঁকা দাগ টেনে লাইন তৈরির পদ্ধতিতে পাথ তৈরি করা যায়। পেন্সিল টুলের কাজ হচ্ছে কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে রেখা টেনে ছবি আঁকার মতো।

পক্ষান্তরে, পেন টুল দিয়ে পাথ তৈরি করা হয় ক্লিক ও ড্র্যাগ করে। পেন টুলের সাহায্যে পাথ তৈরির জন্য–

ক. টুলবক্স থেকে পেন টুল সিলেক্ট করতে হবে। পেন টুলের সাহায্যে পর্দায় যেকোনো জায়গায় ক্লিক করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

খ. কিছুটা উপরের দিকে দ্বিতীয় ক্লিক করে মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

গ. দ্বিতীয় ক্লিকের অবস্থান থেকে নিচের দিকে একটু ডানে ক্লিক করতে হবে।

ঘ. উপরের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করার পর মাউসে চাপ রেখে ডান দিকে ড্র্যাগ করতে হবে।

ঙ. নিচের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করতে হবে। এ ক্লিকের অবস্থান থেকে একটু ডান দিকে পরবর্তী ক্লিক করতে হবে।

চ. উপরের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করার পর মাউসে চাপ রেখে ডান দিকে ড্র্যাগ করতে হবে।

ছ. নিচের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করতে হবে।

এভাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ঢেউয়ের মতো মুক্ত পাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট তৈরি করা যেতে পারে।

পাথ সম্পাদনার কাজ

প্রথমবারেই একটি পাথ প্রত্যাশিত আকারে তৈরি করা সম্ভব হয় না। প্রথমবারে পাথটি তৈরি করার পর নানা প্রকার সম্পাদনার মাধ্যমে পাথটি প্রত্যাশিত আকারে নিয়ে আসতে হয়। পাথ সম্পাদনার জন্য পাথের যেকোন স্থানে নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করা যায়, পাথে বিদ্যমান অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাতিল করে দেওয়া যায় বা ফেলে দেওয়া যায়, পাথের অংশ বিশেষ কেটে বাদ দেওয়া যায়, পাথের দুটি বিচ্ছিন্ন প্রান্ত সংযুক্ত করা যায়। এভাবে যেকোনো পরিবর্তন যতবার প্রয়োজন করা যায়।
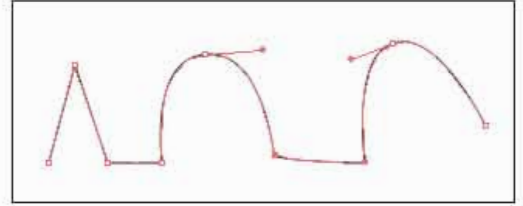
অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করা

পাথের কোনো অবস্থানে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করার জন্য –

ক. টুলবক্স থেকে এ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল (Add Anchor Point Tool) সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করার পর মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে পেন টুলের নিচের ডান দিকে একটি যোগচিহ্ন (+) দেখা যাবে।

খ. অ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল দিয়ে পাথের কোনো স্থানে ক্লিক করলে ঐ স্থানে নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বসে যাবে।

- সোজা পাথের উপর যোগ করা নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট হবে স্ট্রেইট কর্নার অ্যাংকর পয়েন্ট এবং বক্র পাথের উপর যোগ করা অ্যাংকর পয়েন্ট হবে স্মুথ অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট।

অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাদ দেওয়া

পাথে বিদ্যমান কোনো অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাদ দেওয়ার জন্য –

ক. ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল (Delete Anchor Point Tool) সিলেক্ট করতে হবে। ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করার পর মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে পেন টুলের নিচের ডান দিকে বিয়োগ চিহ্ন (-) দেখা যাবে।

খ. ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল দিয়ে কোনো এ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে ঐ অ্যাংকর পয়েন্টটি বাতিল হয়ে যাবে।

পাথের বক্রতা সম্পাদনা

পাথ সম্পাদনার কাজ করার জন্য একটি বৃত্ত/আয়তাকার অবজেক্ট বা পেন/পেন্সিল টুল দিয়ে নকশা তৈরি করে নিতে হবে। এরপর বক্রতা সম্পাদনার জন্য –

ক. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করার পর ড্র্যাগ করে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের অবস্থান পরিবর্তন করলে পাথের বক্রতা ও আকার-আকৃতি পরিবর্তিত হবে।

খ. অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে ঐ অ্যাংকর পয়েন্টের হ্যান্ডল দৃশ্যমান হবে। হ্যান্ডলের যেকোনো প্রান্তের কন্ট্রোল পয়েন্টে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অ্যাংকর পয়েন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাথের অংশ বা রেখাংশের বক্রতা বাড়াতে বা কমাতে হবে, বক্রতার পরিমাণ কম-বেশি করতে হবে বা বক্রতার দিক পরিবর্তন করতে হবে।

পেন্সিল টুল এবং পেন টুল দিয়ে মুক্ত পাথ তৈরি করার পর স্ট্রোক হিসেবে মোটা-চিকন করা যাবে এবং রং আরোপ করা যাবে। পেন্সিল টুল এবং পেন টুল দিয়ে বন্ধ পাথ তৈরি করার পর ফিল কালার দিয়ে যেকোনো রঙে পূরণ করা যাবে।

লেখালেখির কাজ

বই ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, কার্ড ইত্যাদি সব কিছুতেই লেখার কাজ থাকে। ইলাস্ট্রেটরে লেখালেখি বা টাইপের কাজ করার জন্য টাইপ টুল (Type Tool) ব্যবহার করা হয়। ইলাস্ট্রেটরে ৬ প্রকার টাইপ টুল রয়েছে। এসব টাইপ টুলের সাহায্যে তিনভাবে লেখা বিন্যাসের কাজ করতে হয়। যেমন- পয়েন্ট টেক্সট (Point Text), এরিয়া টেক্সট (Area Text) এবং পাথ টেক্সট (Path Text)।

পয়েন্ট টেক্সট

পয়েন্ট টেক্সট (Point Text) পদ্ধতিতে টাইপ করার নিয়ম খুবই সহজ। এ পদ্ধতিতে টাইপ করার জন্য–

ক. টুলবক্স থেকে টাইপ টুল (Type Tool) সিলেক্ট করতে হবে।

খ. পর্দার যেকোনো ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করতে হবে।

গ. বাংলায় টাইপ করার জন্য কীবোর্ডকে বাংলা কীবোর্ডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

ঘ. পর্দার উপরে রিবনে ক্যারেক্টার (Character) লেখার উপর ক্লিক করলে ক্যারেক্টার (Character) প্যালেট পাওয়া যাবে। ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের ফন্ট (Font) পপ-আপ মেনু থেকে সিলেক্ট করতে হবে।

ঙ. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের নিয়মে টাইপ করার কাজ শুরু করতে হবে। সিলেকশন টুল দিয়ে যেকোনো অক্ষরের উপর ক্লিক করলে লেখাগুলোর নিচে একটি রেখা দেখা যাবে। এই রেখাকে বলা হয় বেজলাইন (Baseline)।

লেখা সম্পাদনা

লেখা সম্পাদনার প্রয়োজনীয় কমান্ডগুলো পাওয়া যায় টাইপ (Type) মেনুতে এবং ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটে। উইন্ডো মেনুর টাইপ (Type) কমান্ড থেকে ক্যারেক্টার (Character) সিলেক্ট করলে অথবা কীবোর্ডের কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে ঐ বোতামে চাপ দিলে পর্দায় ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটটি ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ক্যারেক্টার (Character) প্যালেট ভাসমান থাকা অবস্থায় যখন প্রয়োজন তখনই ব্যবহার করা যাবে।

অক্ষর সিলেক্ট করা

টাইপ টুল সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের নিয়মে অক্ষর, শব্দ সিলেক্ট করতে হবে। ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখার মধ্যে ক্লিক করলে একবারে টাইপ করা সবটুকু অংশ, অর্থাৎ একই বেজলাইন বিশিষ্ট পুরো লেখা সিলেক্টেড হবে। এ ক্ষেত্রে অক্ষরগুলো হাইলাইটেড হবে না। অক্ষরের নিচ দিয়ে বেজলাইন দেখা যাবে।

অক্ষরের রং পরিবর্তন করা

অক্ষরের রং পরিবর্তন করার জন্য –

ক. প্রয়োজনীয় অক্ষর বা যেকোনো পরিমাণ লেখা সিলেক্ট করতে হবে।

খ. কালার প্যালেটের বার-এ বা সোয়াচ প্যালেটের যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে, সিলেক্টেড অক্ষর/শব্দ/লেখায় সেই রং আরোপিত হবে।

অক্ষর মুছে ফেলা

এক বা একাধিক অক্ষর বা শব্দ, অনুচ্ছেদ বা গোটা লেখা সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস বা ডিলিট (Backspace/Delete) বোতামে চাপ দিলে সিলেক্টেড অক্ষর বা শব্দ বা অনুচ্ছেদ বা গোটা লেখা মুছে যাবে।

অক্ষর ছোট-বড় করা

ক. অক্ষর বা অক্ষরগুলো বা পুরো শব্দ সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ক্যারেক্টার প্যালেটের ফন্ট সাইজ (Font Size) ঘরের ডান দিকের নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে অক্ষরের আকার (Font Size)-এর মাপসূচক সংখ্যার তালিকা দেখা যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্র্যাগ করে কোনো মাপসূচক সংখ্যার উপর নিয়ে গেলে ওই মাপসূচক সংখ্যাটি সিলেক্ট হবে। মাপসূচক সংখ্যাটি সিলেক্ট হওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে সিলেক্ট করা অক্ষর বা অক্ষরগুলো ওই মাপ অনুযায়ী ছোট বা বড় হবে।

খ. ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকায় প্রয়োজনীয় মাপ সূচক সংখ্যা পাওয়া না গেলে সরাসরি ফন্ট সাইজ (Font Size) ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

- কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস (Backspace) বোতামে চাপ দিয়ে বিদ্যমান মাপসূচক সংখ্যা মুছে ফেলে নতুন মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করতে হবে।
- কীবোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে টাইপ করা মাপসূচক সংখ্যা অনুযায়ী সিলেক্ট করা অক্ষর বা অক্ষরগুলো ছোট বা বড় হয়ে যাবে।

অক্ষরকে খাড়াখাড়ি এবং পাশাপাশি ছোট-বড় করা

লেখার অক্ষরগুলোকে খাড়াখাড়ি ছোট-বড় করার জন্য-

ক. ভার্টিক্যাল স্কেল (Vertical Scale) ঘরের ডান দিকের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে সংখ্যাসূচক তালিকা পাওয়া যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্র্যাগ করে ১০০%-এর চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যা সিলেক্ট করলে লেখা খাড়াখাড়িভাবে বড় হবে এবং ১০০%-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা টাইপ করলে লেখা খাড়াখাড়িভাবে ছোট হবে। ১০০% হচ্ছে অক্ষরের স্বাভাবিক মাপ।

লেখার অক্ষরগুলোকে পাশাপাশি ছোট-বড় করার জন্য-

খ. হরাইজন্টাল স্কেল (Horizontal Scale) ঘরের ডান দিকের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে সংখ্যাসূচক তালিকা পাওয়া যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্র্যাগ করে ১০০%-এর চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যা সিলেক্ট করলে লেখা পাশাপাশি বড় হবে এবং ১০০%-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা টাইপ করলে লেখা পাশাপাশি ছোট হবে। ১০০% হচ্ছে অক্ষরের স্বাভাবিক মাপ।

বেজলাইন শিফট

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখা সিলেক্ট করলে লেখার নিচ দিয়ে যে লাইন দেখা যায় সেই লাইনকে বলা হয় বেজলাইন (Baseline)। বেজলাইন থেকে লেখার নিচের প্রান্ত উপরে তুলে নেওয়া বা নিচে নামিয়ে আনাকেই বলা হয় বেজলাইন শিফট (Baseline Shift)।

- ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের সেট দি বেজলাইন শিফট (Set the Baseline Shift) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকা থেকে মাপসূচক সংখ্যা সিলেক্ট করে অথবা সেট দি বেজলাইন শিফট (Set the Baseline Shift) ঘরে মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করে বেজলাইন শিফট (Baseline Shift)-এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করলে অক্ষর বেজলাইন থেকে নিচের দিকে নেমে আসে এবং ধনাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করলে লেখা বেজলাইন থেকে উপরের দিকে উঠে যায়।

লিডিং

লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় লিডিং (Leading)। একাধিক লাইন বিশিষ্ট লেখার ক্ষেত্রে লিডিং কম-বেশি করার প্রয়োজন হতে পারে।

ক. ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকা থেকে মাপসূচক সংখ্যা সিলেক্ট করে অথবা সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরে সরাসরি মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করার পর কীবোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে লিডিং (Leading) কার্যকর হবে।

খ. সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরের ঊর্ধ্বমুখী তীর বোতামে চাপ দিলে লিডিংয়ের পরিমাণ বাড়বে এবং নিম্নমুখী তীর বোতামে চাপ দিলে লিডিংয়ের পরিমাণ কমবে ।

এরিয়া টেক্সট

বর্গাকার বা আয়তাকার, বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বা অন্য যেকোনো প্রকার বন্ধ পাথের ভেতরে টাইপ করা বা স্থাপিত লেখাকে এরিয়া টেক্সট (Area Text) বলা হয়। বন্ধ পাথের মধ্যে লেখা বিন্যস্ত করার জন্য বা টাইপ করার জন্য–

ক. বর্গাকার বা আয়তাকার, বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বন্ধ পাথ তৈরি করে নিতে হবে।

খ. টাইপ টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার বন্ধ পাথের উপর স্থাপন করলে টাইপ টুলটি এরিয়া টাইপ টুলের রূপ ধারণ করবে।

আমাদের দেশে হবে
সেই ছেলে কবে কথায় না বড়
হয়ে কাজে বড় হবে। আমাদের
দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না
বড় হয়ে কাজে বড় হবে। আমাদের
দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে
বড় হবে।
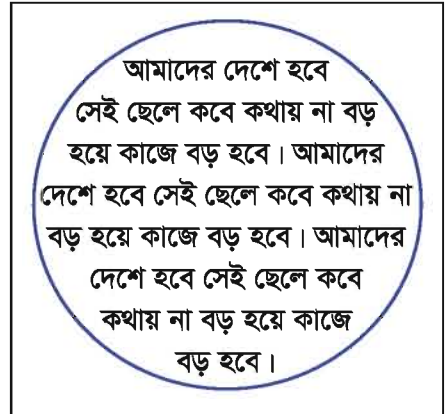
গ. পাথের অ্যাংকর(Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে বন্ধ পাথের ভেতরে ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যাবে এবং বন্ধ পাথটি টেক্সট বক্স (Text Box) বা লেখার আধার (Text Container) হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ঘ. টাইপের কাজ শুরু করতে হবে।

ঙ. টাইপ করে ডান পাশের প্রান্তে পৌঁছে গেলে ইনসার্সন পয়েন্টার আপনাআপনিই নিচের লাইনে চলে আসবে। এভাবে টাইপ করে যেতে থাকলে একটি লাইন শেষ হওয়ার পর আপনাআপনিই পরবর্তী লাইন শুরু হবে।

পাথে টাইপ করা

ইলাস্ট্রেটরের পাথ টাইপ টুলের সাহায্যে বন্ধ পাথের বাইরের দিকে ও ভেতরে দিকে এবং মুক্ত পাথের উপরের দিকে ও নিচের দিকে টাইপের কাজ করা যায়। মনোগ্রাম জাতীয় কাজের জন্য বৃত্ত বা বর্গাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে বা ভেতরের দিকে টাইপের কাজ করতে হয়।

বৃত্তাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে টাইপ করা

ক. বৃত্তাকার অবজেক্ট তৈরি করতে হবে এবং বৃত্তটি রং দ্বারা পূরণ (Fill) করা থাকলে কালার প্যালেটের None আইকন বা টুল বক্সের None আইকন ক্লিক করে বৃত্তটির রং বাদ দিতে হবে।

খ. বৃত্তটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় টুল বক্স থেকে টাইপ অন-এ পাথ টুল (Type on a Path Tool) সিলেক্ট করতে হবে এবং টাইপ অন-এ পাথ টুল (Type on a Path Tool) দিয়ে বৃত্তটির

অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে বৃত্তটির পাথের বাইরে ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যাবে।

- ক্লিক করার সময় বৃত্তটি সিলেক্টেড থাকতে হবে। কোনো কারণে সিলেক্টেড না থাকলে সিলেক্ট করে ১ ও ২ নম্বর ধাপের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

গ. টাইপের কাজ শুরু করলে স্বাভাবিক নিয়মে বাম দিক থেকে ডান দিকে টাইপ করা লেখা বৃত্তের পাথ ধরে অগ্রসর হয়ে যাবে। একই নিয়মে প্রয়োজন হলে আয়তাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে লেখা বিন্যস্ত করতে হবে।

ঘ. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল (Direct Selection Tool) দিয়ে লেখায় ক্লিক করলে বৃত্তের পাথ ও লেখার মধ্যে আই-বিম সিলেক্ট হবে।

ঙ. আই-বিমের উপরের বা নিচের প্রান্তে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে লেখাকে চক্রাকারে টেনে যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

মুক্ত পাথে লেখা বিন্যস্ত করা

ক. পেন্সিল টুল অথবা পেন টুলের সাহায্যে মুক্ত পাথ বা রেখা তৈরি করতে হবে।

খ. সিলেক্টেড পাথের উপর পাথ টুল দিয়ে ক্লিক করলে পাথের উপর ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যাবে।
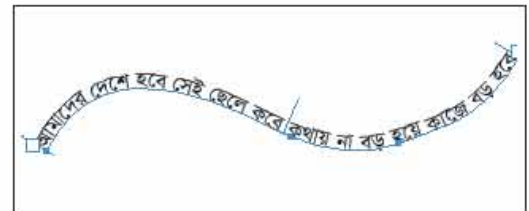
গ. স্বাভাবিক নিয়মে টাইপ করতে হবে।

- ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখায় ক্লিক করলে পাথ ও লেখা সিলেক্টেড হবে এবং সিলেক্টেড অবস্থায় আই-বিমে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে লেখা যেকোনো দিকে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

- ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে পাথের উপর ক্লিক করলে পাথ সিলেক্টেড হবে এবং পাথের অ্যাংকর পয়েন্টগুলো দৃশ্যমান হবে। এ অবস্থায় পাথ সম্পাদনার নিয়মে পাথ আঁকাবাঁকা এবং ছোট-বড় করা যাবে। পাথ আঁকাবাঁকা করলে লেখাও পাথের উপর আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হবে।
- লেখার তুলনায় পাথ ছোট হলে বাড়তি লেখা দেখা যাবে না। পাথ বড় করে দিলে অবশিষ্ট লেখা দেখা যাবে।

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করা

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করা হলে অক্ষরের প্রান্তগুলো পাথে পরিণত হয়। আউটলাইনে পরিণত অক্ষরের পাথে এবং অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যায়।

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করার জন্য –

ক. এক বা একাধিক অক্ষর বা শব্দ সিলেক্ট করতে হবে।

খ. টাইপ (Type) মেনু থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন (Create Outline) কমান্ড দিলে অথবা কীবোর্ডের শিফট (Shift) ও কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম একসঙ্গে চেপে রেখে O বোতামে চাপ দিলে সিলেক্ট করা লেখা আউটলাইন (Outline)-এ পরিণত হবে।

অক্ষর আউটলাইনে পরিণত হওয়ার পর লেখাগুলো আর ফন্ট হিসেবে থাকবে না। গ্রাফিক্সে পরিণত হবে। তখন পাথ সম্পাদনার নিয়মে অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে এবং যেকোনো রং আরোপ করা যাবে, গ্রেডিয়েন্ট প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ফন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইলাস্ট্রেটরে ছবি বা ইমেজ স্থাপন করা

ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরে স্থাপন করার জন্য–

ক. ফাইল (File) মেনু থেকে প্লেস (Place) কমান্ড দিলে প্লেস (Place) ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।

খ. প্লেস (Place) ডায়ালগ বক্সে প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে বের করে সিলেক্ট করতে হবে।

- আগে থেকে জানা থাকতে হবে প্রয়োজনীয় ফাইলটি কি নামে কোন ফোল্ডারে রয়েছে। নির্দিষ্ট ফোল্ডারটি খোলার পর প্রয়োজনীয় ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে।

গ. ডায়ালগ বক্সের প্লেস (Place) বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা ফাইলটির ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরের পর্দায় স্থাপিত হবে।

- ফটোশপের ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরে স্থাপিত হওয়ার পর গোটা ছবি বা ইমেজ জুড়ে একটি ক্রস চিহ্ন থাকবে। বাইরে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করলে ছবি থেকে ক্রস চিহ্ন চলে যাবে। সিলেকশন টুল দিয়ে ছবির উপর ক্লিক করলে ছবিটি সিলেক্টেড হবে, চার কোণে চারটি ও চার বাহুতে চারটি রিসাইজ বক্স বিদ্যমান থাকবে। রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবি ছোট-বড় করা যাবে।

দলগত কাজ
- ফটোশপ ব্যবহার করে যেকোনো একটি ছবি সম্পাদনা করে দেখাও।
- যেকোনো একটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি মনোগ্রাম ইলাস্ট্রেটরে অঙ্কন কর।

*সফটওয়্যারের সংস্করণ ভিন্নতার কারণে টাইটেল ও মেনু বারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

অনুশীলনী

১. মাল্টিমিডিয়া কয়টি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত?
   ক. ১   খ. ২
   গ. ৩   ঘ. ৪

২. মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় কোনটিতে?
   ক. বিদ্যালয়ের ফলাফল প্রস্তুতিতে   খ. বাজারের হিসাব করতে
   গ. ক্রিকেট খেলার রান হিসাব করতে   ঘ. অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরিতে

৩. কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার?
   ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড   খ. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট
   গ. মাইক্রোসফট এক্সেল   ঘ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

৪. মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ–
   i. বর্ণ বা টেক্সট এর প্রকাশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে
   ii. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে সহজ করেছে
   iii. হিসাবের কাজকে সহজ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রকিব একটি কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা। আগামীকাল বিদেশ থেকে একদল পরিদর্শক তার কোম্পানি পরিদর্শনে আসবে। তিনি তাঁর ল্যাপটপে বসে ঠিক করছেন অতিথিদের তাঁর কোম্পানি সম্পর্কে কী কী দেখাবেন। একাজে তিনি একটি সফটওয়্যারের সাহায্য নিলেন।

৫. বিদেশি অতিথিদের সামনে উপস্থাপনের জন্য রকিব সাহেবের জন্য কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার সুবিধাজনক?
   ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড   খ. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট
   গ. মাইক্রোসফট এক্সেল   ঘ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

৬. রকিব সাহেব যে সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন তাতে–
   i. অ্যানিমেশন ব্যবহার করে উপস্থাপনকে আকর্ষণীয় করা যাবে
   ii. শব্দ ও ভিডিও ব্যবহার করে কোম্পানির কার্যক্রম দেখানো যাবে
   iii. কোম্পানির আয় ব্যয়ের হিসাব করা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭. কোনো কিছু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৮. 'বর্তমানে প্রকাশনা শিল্প সম্পূর্ণভাবে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল'– উক্তিটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডেটাবেজ-এর ব্যবহার
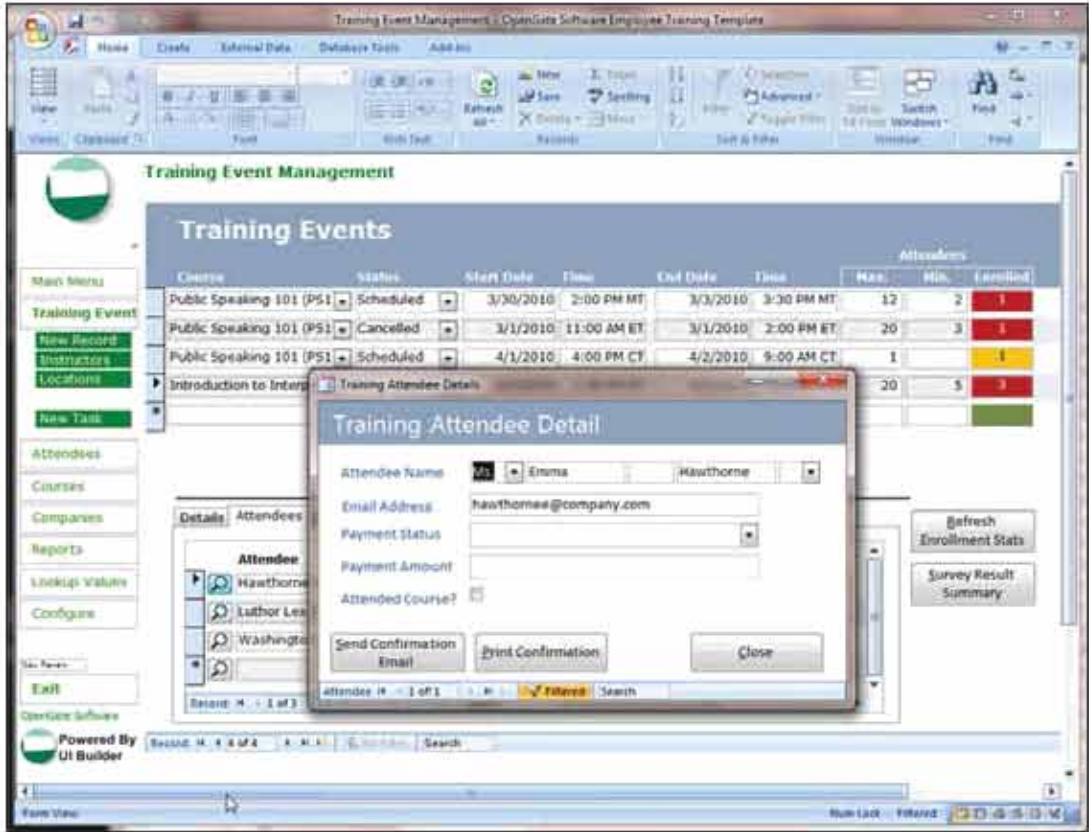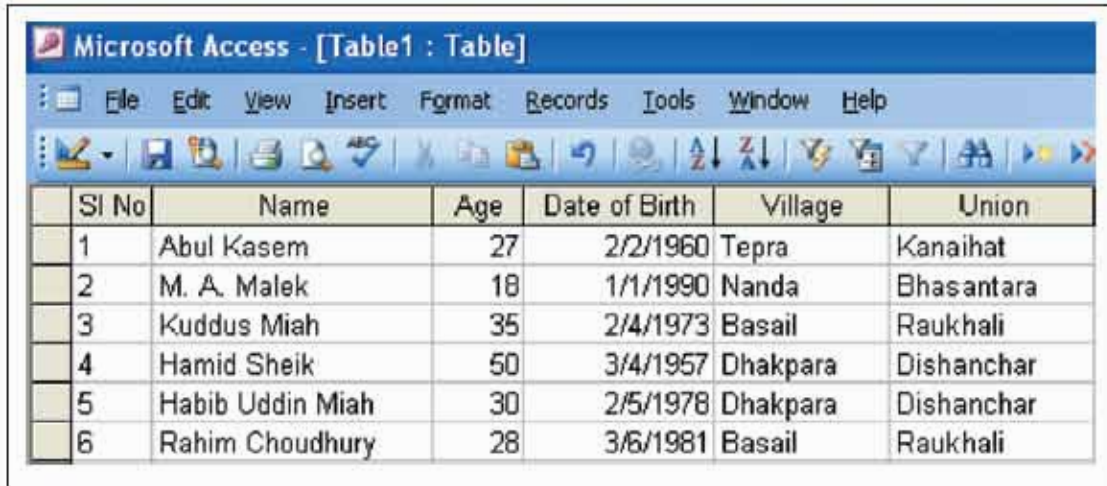
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা...

- ডেটাবেজ-এর ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) ব্যবহারের কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সফটওয়্যার ব্যবহার করে একটি ডেটাবেজ তৈরি করতে পারব।

ডেটাবেজ সম্পর্কে ধারণা

ডেটাবেজকে বলা হয় তথ্যভাণ্ডার। ডেটাবেজ হলো কম্পিউটারভিত্তিক একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে সংগৃহীত উপাত্ত সংরক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা যায়। অন্য কথায়, ডেটাবেজ হচ্ছে সংগৃহীত উপাত্তের ভাণ্ডার, যা থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে এবং আকারে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, ডেটাবেজ হলো অসংখ্য উপাত্তের একটি সুসজ্জিত তালিকা, যেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কোনো উপাত্তকে দ্রুত এবং খুব সহজেই শনাক্ত করার উপায় বা পন্থা আছে। এ তথ্যভাণ্ডারে বিভিন্ন প্রকার এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। একজন ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো তথ্য এ তথ্যভাণ্ডার থেকে আহরণ বা সংগ্রহ করতে পারেন।

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Village	Union
1	Abul Kasem	27	2/2/1960	Tepra	Kanaihat
2	M. A. Malek	18	1/1/1990	Nanda	Bhasantara
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	Basail	Raukhali
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	Dhakpara	Dishanchar
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	Dhakpara	Dishanchar
6	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	Basail	Raukhali

একটি ডেটাবেজ মূলত কলাম এবং সারির সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলামের একটি করে হেডিং বা শিরোনাম থাকে। এই হেডিং বা শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় সেই কলামে কী ধরনের ডেটা বা তথ্য আছে। হেডিং বা শিরোনামগুলো ফিল্ড নামে পরিচিত। আর পাশাপাশি কয়েকটি কলামের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সারি। প্রতিটি সারিকে বলা হয় রেকর্ড।

এখানে SL No, Name, Age, Date of Birth, Village, Union নামের প্রতিটি কলাম হলো এক একটি ফিল্ড এবং এসব ফিল্ডের অধীনে রয়েছে যথাক্রমে Abul Kasem, 27,2/2/1960, Tepra, Kanaihat ইত্যাদি ডেটা। একই সারির এরকম কয়েকটি ফিল্ড মিলে হয় একটি রেকর্ড। উপরের উদাহরণের ডেটাবেজটিতে ৬টি ফিল্ড এবং ৬টি রেকর্ড রয়েছে।

ষাটের দশক থেকে কম্পিউটারে ডেটাবেজ ফাইলে ডেটা সংরক্ষণ শুরু হয়। তখন একটি ডেটাটেবিলের সমন্বয়ে একটি ডেটাবেজ গঠিত হতো। কিন্তু বর্তমানে ডেটাবেজ ধারণা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখন কোনো ডেটাবেজের আওতায় এক বা একাধিক ডেটাটেবিল, কুয়েরি, ফর্ম, রিপোর্ট, ইত্যাদি ফাইল থাকতে পারে। অর্থাৎ ডেটাবেজ হচ্ছে ডেটা তথ্যসমৃদ্ধ এক বা একাধিক ফাইলের সমষ্টি।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হলো মাইক্রোসফট এক্সেস, ফক্সপ্রো, ডিবেজ, ফক্সবেইজ, ওরাকল, ফোর্থ ডাইমেনশন, প্যারাডক্স প্রভৃতি।

ডেটাবেজ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য

- ডেটাবেজে বিভিন্ন ধরনের টেবিল তৈরি করে তাতে অজস্র ডেটাকে সুসংগঠিত করে রাখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়।
- ডেটাবেজে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে কাঙ্ক্ষিত যেকোনো তথ্যকে দ্রুত খুঁজে বের করা যায়।
- বৃহৎ ডেটাবেজের অসংখ্য রেকর্ড থেকে শুধু প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে প্রিন্ট করা যায়। রিপোর্টে পছন্দমতো গ্রাফ, চার্ট এবং ছবি সংযোজন করা যায়।
- ডেটাবেজের অসংখ্য রেকর্ড থেকে শুধু প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ নিয়ে মেইলিং লেবেল তৈরি করা যায়।
- ডেটাবেজ প্রোগ্রামে ডেটা এন্ট্রি করার সময় যাতে ভুল না হয় সেজন্য ফিল্ডে শর্ত দিয়ে ডেটা এন্ট্রির সীমা নির্ধারণ করা যায়। একে ইনপুট ভেলিডেশন বলা হয়। যেমন : কোন ডেটা টেবিলের Salary ফিল্ডের বেতন এন্ট্রি করা হচ্ছে। সর্বনিম্ন বেতন হলো ২০০০ এবং সর্বোচ্চ বেতন হলো ১১৫০০। এ ফিল্ডে ইনপুট ভেলিডেশনে যদি >=2000 and <=11500 শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে ২০০০-এর সমান বা উপরে এবং ১১৫০০-এর নিচে বা সমান এন্ট্রি করা না হলে এন্ট্রি হবে না এবং ভুল বার্তা প্রদর্শিত হবে।
- কুয়েরিতে বিভিন্ন শর্তারোপ করে ডেটাবেজ থেকে রেকর্ডসমূহকে আলাদা করে ডেটা টেবিল তৈরি করা যায়।
- একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য রিলেশন তৈরি করা যায়।
- ডেটাবেজ থেকে তথ্য খোঁজ করার জন্য ইন্ডেক্স ব্যবহার করা হয়। কোনো ফিল্ডের উপর ইন্ডেক্স করা হলে উক্ত ফিল্ডের ভেল্যু এবং রেকর্ড রেফারেন্স একটি অর্ডার অনুসারে সজ্জিত হয়। ইন্ডেক্স ফাইল মূল ডেটা ফাইলের কোনো রূপ পরিবর্তন না করে রেকর্ডসমূহ বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে। সূচি দেখে কোন বই থেকে যেমন কোনো বিষয় সহজে খুঁজে বের করা যায় (তেমনি ডেটাবেজ থেকেও সহজে তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব)।
- ফাইলসমূহের মধ্যে লিংক তৈরি করা যায়। ফলে একই তথ্য যেটি লিংক করা অন্যান্য ফাইলে আছে সেটি আপডেট করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব ফাইলেই আপডেট হবে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডেটাবেজে উপাত্তগুলোর রেকর্ড স্ট্রাকচার পরিবর্তন করা যায়। একই কাজ বারবার করতে হয় এমন সব কাজের সমষ্টিকে Macro তৈরির মাধ্যমে একটি Single Action-এ রূপান্তর করে পরবর্তীতে যতবার ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়। এতে একদিকে যেমন সময়ের সাশ্রয় হয়, অন্যদিকে তেমনি একই কাজ বারবার করার ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

DBMS এর ব্যবহারের কৌশল

একটি সিস্টেম একক ভাবে গড়ে উঠে না। সিস্টেম হলো কতগুলো বিষয়ের সমন্বিত রূপ। তেমনি কতগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের সমন্বয়ে ডেটাবেজ সিস্টেম গঠিত হয়। মূলত ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) ব্যবহারকারী এবং ডেটাবেজের মধ্যে একটি ইন্টারফেস (উভয়দিক সংযোগ রক্ষাকারী) হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন (যেমন: ডেটা মুছে ফেলা, প্রবেশ, উত্তোলন করা) সম্পন্ন করতে অনুরোধ করে। ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধগুলো DBMS এর মাধ্যমে ডেটাবেজের উপর কার্যকরী করে ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনীয় ডেটা প্রদান করে।
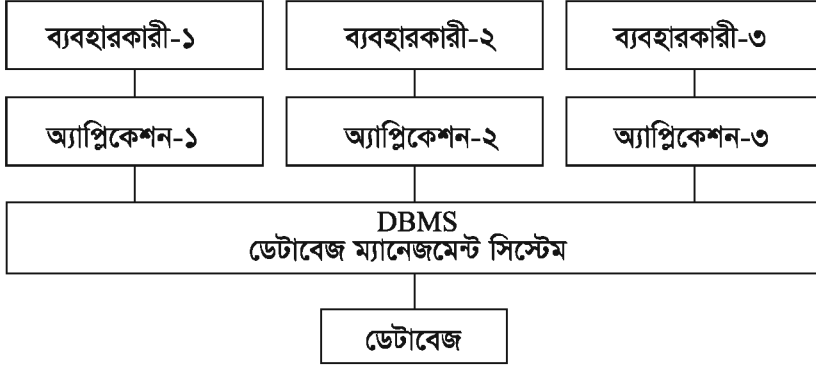
DBMS এর গুরুত্ব

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রধান কার্যবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. নতুন রেকর্ড সংযোজন করা;
২. প্রয়োজনে রেকর্ড আপডেট করা;
৩. অপ্রয়োজনীয় রেকর্ড মুছে ফেলা;
৪. ডেটা সংরক্ষণ করা;
৫. ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৬. ডেটার অনুলিপি (ডুপ্লিকেশন) রোধ করা;
৭. রিপোর্ট তৈরি করা;
৮. নির্দিষ্ট ডেটা অনুসন্ধান করা, ইত্যাদি।

বিপুল পরিমাণ উপাত্ত নিয়ে তৈরি ডেটাবেজের বহুমুখী ব্যবহারই হচ্ছে ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার কাজ। সাধারণত অনেক জনবল বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের হিসাব, বেতন-বিল তৈরি, ব্যক্তিগত নথি, মজুদ মালামালের হিসাব ইত্যাদি নানা কাজে ডেটাবেজের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু হিসাব নিকাশ, লেনদেন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা, গবেষণা, সামাজিক উন্নয়ন, বই, জার্নাল ও সাময়িকীতে সরাসরি এবং খুব সহজে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন তৈরিতে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা যেতে পারে।

ডেটাবেজ ও এক্সেস সম্পর্কে ধারণা

কম্পিউটারে ডেটাবেজের কাজ করা হয় প্রধানত মাইক্রোসফট এক্সেস সফটওয়্যারের সাহায্যে। মাইক্রোসফট এক্সেস হচ্ছে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের একটি জনপ্রিয় ডেটাবেজ সফটওয়্যার।

এক্সেস প্রোগ্রামে কাজ শুরুর প্রস্তুতি

এক্সেস প্রোগ্রামের সাহায্যে ডেটাবেজের কাজ করার জন্য কম্পিউটারে অবশ্যই মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস ইনস্টল করা থাকতে হবে। যদি না থাকে তাহলে ইনস্টল করে নিতে হবে।

এক্সেস প্রোগ্রাম খোলা

মাইক্রোসফট এক্সেস প্রোগ্রাম খোলার জন্য–

১. পর্দার নিচের দিকে বাম কোণে স্টার্ট (Start) বোতামের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু বা তালিকা আসবে।

৩. এ মেনুর অল প্রোগ্রামস (All Programs) কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে আর একটি মেনু পাওয়া যাবে।

৪. এ মেনু তালিকা থেকে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office) মেনুতে ক্লিক করলে আর একটি মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)-এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৫. এ তালিকা থেকে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস (Microsoft Office Access) কমান্ড সিলেক্ট করলে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস (Microsoft Office Access) খুলে যাবে।

৬. মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস উইন্ডোর উপরের বাম দিকে অবস্থিত Blank Database আইকন ক্লিক করার পর ব্লাংক ডেটাবেজ ফাইলের নাম দেওয়ার জন্য ডায়ালগ বক্সের File Name ঘরে ডেটাবেজের জন্য একটি নাম টাইপ করতে হবে। এক্ষেত্রে Practice-1 টাইপ কর।

৭. File Name এডিট বার-এর ডান দিকে ফোল্ডার আইকন ক্লিক করলে নতুন নামে তৈরি করা ফাইল সংরক্ষণের জন্য ডায়ালগ বক্সের File Name ঘরে Practice-1 বিদ্যমান থাকবে। এ নামের ফাইলটি কোনো ফোল্ডারে সংরক্ষণ করতে হলে ফোল্ডারটি তৈরি করে নিতে হবে।
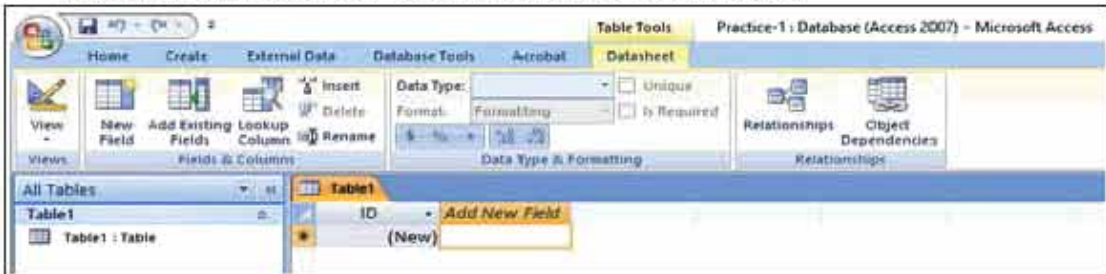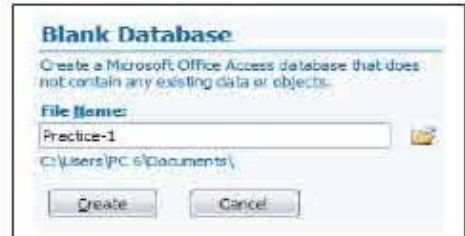
৮. ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে আগের ডায়ালগ বক্সটি ফিরে আসবে।

৯. ডায়ালগ বক্সের Create বোতামে ক্লিক করলে টেবিল তৈরি করার আগের অবস্থায় একটি শূন্য ডেটাবেজ উইন্ডো আসবে। এ উইন্ডোর টাইটেল বার-এ লেখা থাকবে 'Practice-1: Database ... '।

ডেটাবেজ টেবিল তৈরি

Practice-1 উইন্ডো থেকে টেবিল তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। এ জন্য–

১. View ড্রপ-ডাউন থেকে Design View সিলেক্ট করলে সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের টেবিল নেম ঘরে Table1 নাম থাকবে। এ নামেই ডেটাবেজ টেবিলটি সেভ হবে। সেভ করার জন্য ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

২. ডেটাবেজ টেবিলের ফিল্ড নির্ধারণের উইন্ডো উপস্থাপিত হবে।

৩. Field Name ঘরে ক্রমিক নম্বর (Sl No) টাইপ করে কীবোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর Data Type ঘরে চলে যাবে। এ ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ডেটার বিভিন্ন প্রকার ধরন বা টাইপের তালিকা দেখা যাবে। যেমন- Text, Number, Currency, Date/Time ইত্যাদি।

- এ তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। নম্বর সিলেক্ট করলে এ ফিল্ডের ডেটা দিয়ে অঙ্ক বা হিসাবের কাজ করা যাবে। তারিখ/সময় ফিল্ডের ডেটা বা তথ্যের ভিত্তিতে বয়স বের করা যাবে এবং বয়স সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করা যাবে। বর্ণভিত্তিক ফিল্ডের ডেটার সাহায্যে গাণিতিক কাজ, যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যাবে না।

- ডেটা টাইপ সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে ফিল্ডস প্রোপার্টি অংশে ডেটার আরও কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দিতে হবে। যেমন- Field Size-এর ডান পাশের ঘরে নির্ধারণ করে দিতে হবে কোন ফিল্ডের আকার কত বড় হবে এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। এ ফিল্ডের একটি নিজস্ব মান থাকে। প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করা যায়। ফিল্ড সাইজ প্রয়োজনের তুলনায় একটু বড় হওয়া ভালো। এতে ডেটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তবে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি বড় করাও ঠিক নয়।

৪. ফিল্ডের নাম টাইপ করা শেষ হলে উপরের বাম কোণে ভিউ আইকন ক্লিক করলে অথবা ভিউ ড্রপ-ডাউন থেকে Datasheet View সিলেক্ট করলে টেবিলটি সেভ করার জন্য একটি ডায়ালগ বক্স আসবে।

৫. ডায়ালগ বক্সের Yes বোতামে ক্লিক করলে ডেটা এন্ট্রি করার জন্য ডেটাশিট ভিউ বা Table1 ভিউ উইন্ডো আসবে। এ উইন্ডোতে ডেটা এন্ট্রি করতে হবে।
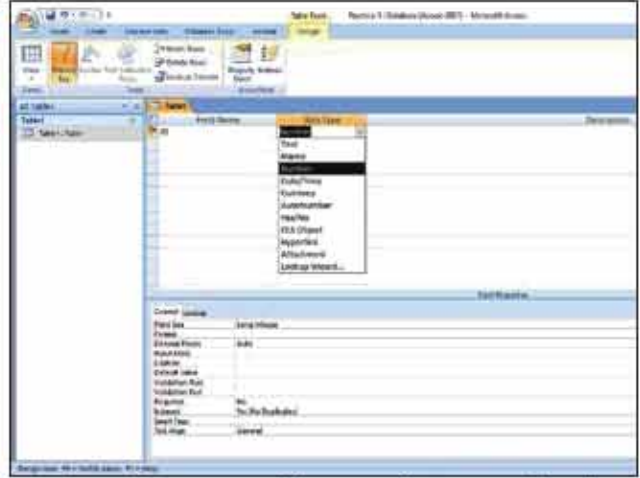
ডেটা এন্ট্রি করা

ডেটাশিট ভিউয়ে টেবিলের প্রথম ফিল্ডটি সিলেক্টেড থাকবে। না থাকলে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সাধারণ নিয়মে টাইপ করে টেবিলে ডেটা এন্ট্রি বা তথ্য সন্নিবেশিত করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ডেটা এন্ট্রির শুরুতেই ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে নেওয়া যেতে পারে। না হলে ডেটা এন্ট্রির যেকোনো সময় ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে নেওয়া যায়।

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Village	Union	Add New Field
1	Kasem	27	2/2/1960	Tepra	Kanaihat	
2	Malek	18	1/1/1990	Nanda	Bhasantara	
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	Basil	Raukhali	
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	Dhakpara	Dishanchar	
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1976	Dhakpara	Dishanchar	
6	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	Basil	Raukhali	
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	Nanda	Bhasantara	
8	Rahima Banu	25	3/5/1982	Tepra	Kanaihat	
9	M A Kalam	16	2/6/1992	Basil	Raukhali	
10	Charubala Dasi	60	5/4/1948	Nanda	Bhasantara	
11	Khokon Molla	15	6/9/1993	Tepra	Kanaihat	
12	M A Latif	22	3/5/1985	Basil	Raukhali	
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	Nanda	Bhasantara	
14	Mimin Uddin Sheik	55	3/4/1953	Dhakpara	Dishanchar	
15	Kaiman Nesa	33	2/3/1974	Tepra	Kanaihat	
16	Rahela Khatun	24	1/9/1983	Tepra	Kanaihat	
17	Narendra Halder	70	6/6/1936	Nanda	Bhasantara	

এক ফিল্ডের ডেটা টাইপ করা হয়ে গেলে কীবোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর পরবর্তী ফিল্ডে চলে যাবে। সর্বশেষ ফিল্ডের ডেটা টাইপ করে কীবোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর পরবর্তী রেকর্ডের প্রথম ফিল্ডে চলে আসবে। একই নিয়মে একটি টেবিল বা ডেটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পর পর সংরক্ষণ করতে হবে। Save বা সংরক্ষণ করার জন্য অফিস বোতামের ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে Save কমান্ড দিয়ে বা Save আইকন ক্লিক করে বা কীবোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে S বোতামে চাপ দিয়ে সংরক্ষণের কাজ করতে হবে।

বর্ণিত নিয়মে উপরের ডেটাবেজ টেবিল তৈরি করা যেতে পারে।

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তনের জন্য টেবিলের যেকোনো ঘরে ইনসার্শন পয়েন্টার রেখে ফন্টের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করলে সম্পূর্ণ টেবিলের অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি ঘরের অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না।

বানান সংশোধন

বানান সংশোধনের জন্য যে ঘরের লেখার বানান সংশোধন করতে হবে সেই ঘরে ক্লিক করলে ওই ঘরে ইনসার্শন পয়েন্টার বসে যাবে। বানান সংশোধনের সাধারণ নিয়মে টাইপ করে বানান সংশোধনের কাজ করতে হবে।

ডেটাবেজ ফাইল বন্ধ করা ও খোলা

একটি ডেটাবেজ ফাইলে তথ্য সন্নিবেশিত করা, ভুল সংশোধন করা এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজ একবারে করা সম্ভব হয় না, বিশেষ করে তথ্যের পরিমাণ যদি বেশি হয়। কাজেই, একবারে যতটুকু কাজ করা যায়, ততটুকু কাজ করে ফাইলটি সেভ করে বন্ধ করে রাখতে হয়। পরে আবার ওই ফাইল খুলে বাকি কাজ শুরু করতে হয়।

বন্ধ করে রাখা ফাইল খোলার জন্য-

১. ওই ফাইলটি যে ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডারে যেতে হবে।

২. ফাইলের উপর ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।

৩. উপরের মেনু বার-এ Open বোতামে ক্লিক করলে ডাটাবেজ ফাইলটি খুলে যাবে।

৪. বাম দিকে Table লেখার উপর ডবল ক্লিক করলে ডেটাবেজ হিসেবে তৈরি করা Table খুলে যাবে।

এ অবস্থান থেকে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু করতে হবে।

টেবিলে নতুন ফিল্ড বা কলাম যোগ করা

ডেটাবেজ টেবিলে নতুন ফিল্ড যোগ করার জন্য-

১. View আইকন ক্লিক করে বা ভিউ ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Design View সিলেক্ট করলে Design View উইন্ডো আসবে।

২. এ উইন্ডোতে বর্তমান ফিল্ডগুলোর নাম দেখা যাবে। যে অবস্থানে নতুন ফিল্ড তৈরি করতে হবে তার নিচের ফিল্ডে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

৩. Design মেনুতে ক্লিক করলে ডিজাইন মেনুর রিবন উন্মোচিত হবে। এ রিবনে Insert Rows-এ ক্লিক করলে ইনসার্সন পয়েন্টার বিশিষ্ট ঘরের উপরে একটি শূন্য ফিল্ড যুক্ত হবে।

৪. নতুন ফিল্ডের নাম, ধরা যাক, পুরুষ/মহিলা (Male/Female) টাইপ করতে হবে।

- View আইকন ক্লিক করলে বা ভিউ ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Datasheet View কমান্ড সিলেক্ট করলে সেভ করার জন্য বার্তা আসবে। বার্তা বক্সের Yes বোতামে ক্লিক করতে হবে।

  ডেটাশিট উইন্ডোতে ফিরে গিয়ে দেখা যাবে পুরুষ/মহিলা (Male/Female) নামে একটি নতুন শূন্য ফিল্ড যুক্ত হয়েছে। ফিল্ডটি পূরণ করতে হবে।

ফিল্ড বা কলাম বাতিল করা

অপ্রয়োজনীয় ফিল্ড বাতিল করার জন্য-

১. ফিল্ডটি সিলেক্ট করতে হবে। ফিল্ডের উপর ইনসার্সন পয়েন্টার স্থাপন করলে ইনসার্সন পয়েন্টারটি নিম্নমুখী তীরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থায় ক্লিক করলে পুরো কলাম সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

২. Home মেনু বা ডেটাশিট মেনুর রিবনে Delete আইকন ক্লিক করলে ফিল্ডসহ পুরো কলাম বাতিল হয়ে যাবে।

বাতিলের কমান্ড কার্যকর হওয়ার আগে সতর্কতাসূচক বার্তা আসবে। বার্তাবক্সে 'হ্যাঁ' সূচক (Yes) বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা ফিল্ড স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে। একবার বাতিল হয়ে গেলে আর Undo করা যায় না।

রেকর্ড বা সারি বাতিল করা

রেকর্ড বা সারি (Row) বাতিল করার জন্য-

১. ওই রেকর্ড বা সারি সিলেক্ট করতে হবে। সারির বাম পাশে ইনসার্সন পয়েন্টারে ক্লিক করলে পুরো সারি সিলেক্টেড হবে।

২. Home মেনুর রিবনে Delete আইকন ক্লিক করলে কমান্ড কার্যকর হওয়ার আগে সতর্কতাসূচক বার্তা আসবে।

৩. বার্তাবক্সে 'হ্যাঁ' সূচক Yes বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা রেকর্ড বা সারি স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে। একবার বাতিল হয়ে গেলে আর Undo করা যায় না।

ডেটার বর্ণানুক্রমিক ও সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস

একটি টেবিল তৈরি করার পর যেকোনো ফিল্ড বা কলামের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ডেটাবেজ বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত (Sort) করা যায়। বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস আরোহী (Ascending) পদ্ধতি এবং অবরোহী (Descending) পদ্ধতি, উভয়ভাবে করা যায়। আরোহী পদ্ধতি হচ্ছে ছোট ক্রম থেকে বড় ক্রমের দিকে যাওয়া (A ...B ...C ..Z, 1 ...10 ...50 ...100) এবং অবরোহী হচ্ছে বড় ক্রম থেকে ছোট ক্রমের দিকে যাওয়া (Z ...C ...B ...A, 100 ...50 ...10 ...1)।

নাম, গ্রাম এবং ইউনিয়ন ফিল্ডের ডেটা বর্ণানুক্রমিক এবং ক্রমিক নম্বর, বয়স এবং জন্মতারিখ ফিল্ডের ডেটা সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস (Sort) করা যায়।

টেবিলের ডেটা বয়সের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করার জন্য এ ফিল্ডের যেকোনো ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে। Home মেনুর রিবনের আরোহী (Ascending) আইকন ক্লিক করলে টেবিলের সমগ্র ডেটা বয়সের ভিত্তিতে আরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে এবং অবরোহী (Descending) আইকন ক্লিক করলে টেবিলের সমগ্র ডেটা বয়সের ভিত্তিতে অবরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

Table1

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Village	Union
11	Khokon Molla	15	8/9/1993	Tepra	Kanaihat
9	M A Kalam	16	2/6/1992	Basil	Raukhali
20	Mishu Mallik	17	2/6/1991	Tepra	Kanaihat
2	Malek	18	1/1/1990	Nanda	Bhasantara
12	M A Latif	22	8/5/1985	Basil	Raukhali
16	Rahela Khatun	24	1/9/1983	Tepra	Kanaihat
8	Rahima Banu	25	3/5/1982	Tepra	Kanaihat
1	Kasem	27	2/2/1960	Tepra	Kanaihat
6	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	Basil	Raukhali
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	Dhakpara	Dishanchar
15	Kaiman Nesa	33	2/3/1974	Tepra	Kanaihat
3	Kuddus Miah	35	2/4/1971	Basil	Raukhali
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	Nanda	Bhasantara
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	Nanda	Bhasantara
19	Nasreen Choudhury	47	2/5/1960	Dhakpara	Dishanchar
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	Dhakpara	Dishanchar
14	Mimin Uddin Sheik	55	3/4/1953	Dhakpara	Dishanchar
21	Arzu Miah	56	3/4/1952	Nanda	
10	Charubala Dasi	60	3/4/1948	Nanda	Bhasantara
18	Abdul Halim Biswas	63	5/5/1947	Basil	Raukhali
17	Narendra Halder	70	6/6/1936	Nanda	Bhasantara
(New)					

ডেটা বিন্যস্তকরণের পর রেকর্ডের অবস্থান পরিবর্তিত হবে। কিন্তু, রেকর্ডের অন্যান্য তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন– বয়সের ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতির বিন্যাসের পর ১১ নম্বর রেকর্ডটি সবার উপরে চলে আসবে। কারণ, ১১ নম্বর রেকর্ডের বয়স সবচেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১১ নম্বর রেকর্ডের অন্যান্য তথ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিন্যাসের কাজটি যদি ভুলক্রমে হয়ে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আনডু কমান্ড দিতে হবে। এতে ফাইলটির বিন্যাস–পূর্ব অবস্থায় পাওয়া যাবে।

তথ্য অনুসন্ধান করা

বিপুল পরিমাণ তথ্য বা ডেটা সংবলিত একটি ডেটাবেজ থেকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম খুঁজে বের করার জন্য-

১. Home মেনুর রিবনের Find আইকন ক্লিক করলে Find and Replace ডায়ালগ বক্স আসবে।

২. যে ব্যক্তিকে খুঁজতে হবে ডায়ালগ বক্সের Find What এডিট বার-এ সেই ব্যক্তির নাম বা নামের অংশ টাইপ করতে হবে।

- নামের অংশ হিসেবে পদবি টাইপ করা যেতে পারে অথবা অন্য যেকোনো অংশ টাইপ করা যেতে পারে।

৩. ডায়ালগ বক্সের Look in: ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Name সিলেক্ট করতে হবে।

- Match ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Any Part of Field সিলেক্ট করতে হবে।

৪. ডায়ালগ বক্সের Find Next বোতামে ক্লিক করতে হবে।

- ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে Find What ঘরে টাইপ করা নাম বা পদবি বা নামের অংশ হিসেবে টাইপ করা শব্দ সিলেক্টেড হয়ে যাবে। এ শব্দটি যদি পদবি হয় বা একই নামের অংশ হয়, তাহলে আবার Find Next বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে একই নামের অংশ বিশিষ্ট বা পদবি বিশিষ্ট পরবর্তী নাম সিলেক্টেড হবে। এভাবে বারবার ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করে করে সকল নাম খুঁজে বের করা যাবে বা দেখা যাবে। সর্বশেষ নাম দেখা হয়ে গেলে পর্দায় এ মর্মে বার্তা প্রদর্শিত হবে যে, সবগুলো নাম খোঁজার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায়, অন্য কোনো নাম খোঁজার প্রয়োজন না থাকলে ডায়ালগ বক্সের Cancel বোতামে ক্লিক করতে হবে।

শর্তযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান

গোটা ডেটাবেজ থেকে শুধু নন্দা গ্রামের মানুষের তথ্য দেখা প্রয়োজন, শুধু রাউখালি ইউনিয়নের মানুষের তথ্য দেখা প্রয়োজন, গোটা ডেটাবেজে যাদের বয়স ৩০ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তাদের তথ্য দেখা প্রয়োজন, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম তাদের তথ্য দেখা প্রয়োজন ইত্যাদি আরও নানা শর্তের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হতে পারে। শর্তের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান করার কাজ খুবই সহজ। শর্তগুলো যুক্ত করার পর অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শর্তের আওতাভুক্ত সকল তথ্য প্রদর্শিত হবে। শর্তযুক্ত তথ্য অনুসন্ধানের পদ্ধতি নিচে বর্ণিত হলো। যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তাদের রেকর্ড অনুসন্ধান করার জন্য –

১. Age ফিল্ডের যেকোনো ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।
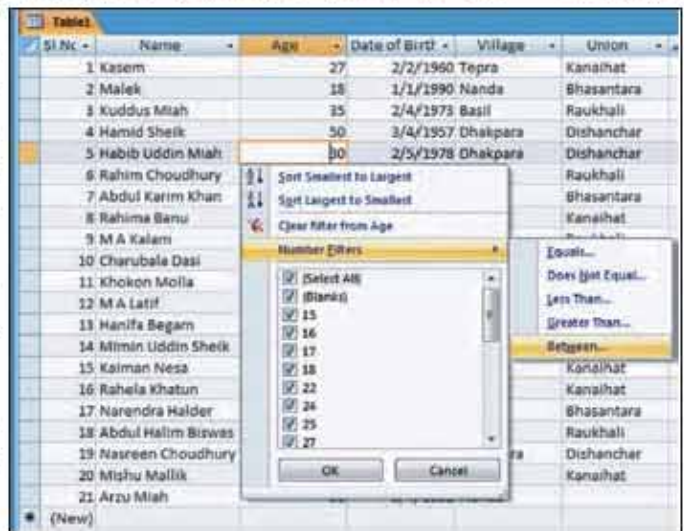
২. রিবনের Filter আইকন ক্লিক করলে ফিল্টার ডায়ালগ বক্স আসবে।

৩. Filter ডায়ালগ বক্সের Number Filters ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে Between সিলেক্ট করলে Between Numbers ডায়ালগ বক্স আসবে।

৪. Between Numbers ডায়ালগ বক্সের Smallest: ঘরে ৩০ এবং Largest: ঘরে ৬০ টাইপ করে ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

Between Numbers

Smallest:	30
Largest:	60

OK Cancel

৫. যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে শুধু তাদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

শর্তের ভিত্তিতে প্রদর্শিত রেকর্ড আনডু বা বাতিল করার জন্য রিবনে Toggle Filter আইকন মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে আইকনটি Remove Filter হিসেবে কাজ করবে। এতে শর্তের ভিত্তিতে বিন্যাস করা রেকর্ড বিন্যাস-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে এবং Toggle Filter আইকনটি Apply Filter আইকনে পরিণত হবে।

Table1

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Village	Union
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	Basil	Raukhali
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	Dhakpara	Dishanchar
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	Dhakpara	Dishanchar
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	Nanda	Bhasantara
10	Charubala Dasi	60	5/4/1948	Nanda	Bhasantara
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	Nanda	Bhasantara
14	Mimin Uddin Sheik	55	3/4/1953	Dhakpara	Dishanchar
15	Kaiman Nesa	33	2/3/1974	Tepra	Kanaihat
19	Nasreen Choudhury	47	2/5/1960	Dhakpara	Dishanchar
21	Arzu Miah	56	3/4/1952	Nanda	

বিন্যাসটি কার্যকর রাখার জন্য Apply Filter আইকনে ক্লিক করতে হবে।

গ্রামের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান

নমুনা ডেটাবেজে চারটি গ্রামের নাম আছে। এর ভেতর থেকে যেকোনো একটি গ্রামের তথ্য দেখা যেতে পারে। যেকোনো দুটি বা তিনটি গ্রামের তথ্য দেখা যেতে পারে অথবা একটি গ্রাম বাদে অন্য সব গ্রামের তথ্য দেখা যেতে পারে।

যেকোনো একটি গ্রামের তথ্য দেখার জন্য–

১. যে গ্রামের তথ্য দেখার প্রয়োজন সেই গ্রামের নামের ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে। ধরা যাক, বাসাইল (Basail) গ্রামের যেকোনো ঘরে ইনসার্শন পয়েন্টার রাখা হলো।

২. রিবনের Selection আইকন ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে। এ মেনু থেকে–

Table1

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Village	Union	Add New Field
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	Basail	Raukhali	
6	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	Basail	Raukhali	
9	M A Kalam	16	2/6/1992	Basail	Raukhali	
12	M A Latif	22	3/5/1985	Basail	Raukhali	
18	Abdul Halim Biswas	63	5/5/1947	Basail	Raukhali	
(New)						

- Equals "Basail" এবং Contains "Basail" সিলেক্ট করলে শুধু বাসাইল গ্রামের মানুষের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।
- Does not Equal "Basail" এবং Does not Contains "Basail" সিলেক্ট করলে বাসাইল গ্রামের রেকর্ড ব্যতীত অন্য সব গ্রামের মানুষের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে ।

শর্তের ভিত্তিতে প্রদর্শিত রেকর্ড আনডু বা বাতিল করার জন্য উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

একাধিক গ্রামের তথ্য দেখা

একই সঙ্গে একাধিক গ্রামের তথ্য দেখার জন্য-

১. Village ফিল্ডের যেকোনো ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে। এতে Village ফিল্ডের সাথে ডান দিকে ড্রপ-ডাউন তীর যুক্ত হবে। এ ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে একটি শর্ত ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের ভেতরের অংশে-

২. Select All এবং Blanks সংযুক্ত চেকবক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন তুলে দিতে হবে। এরপর-

৩. যেসব গ্রামের তথ্য দেখার প্রয়োজন সেই সব গ্রামের নাম সংযুক্ত চেকবক্সের টিক চিহ্ন রেখে দিতে হবে এবং অন্য সব গ্রামের নাম সংযুক্ত চেকবক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন তুলে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঢাকপাড়া এবং টেপরা গ্রামের নাম সংযুক্ত চেকবক্সের টিক চিহ্ন রেখে অন্য সব চেকবক্সের টিক চিহ্ন তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার-

৪. শর্ত বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে শুধু ঢাকপাড়া এবং টেপরা গ্রামের মানুষের তথ্য প্রদর্শিত হবে।

Table1 | Table1 Filter1

Sl No	Name	Age	Date of Birt	Village	Union
1	Kasem	27	2/2/1960	Tepra	Kanaihat
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	Dhakpara	Dishanchar
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	Dhakpara	Dishanchar
8	Rahima Banu	25	3/5/1982	Tepra	Kanaihat
11	Khokon Molla	15	8/9/1993	Tepra	Kanaihat
14	Mimin Uddin Sheik	55	3/4/1953	Dhakpara	Dishanchar
15	Kaiman Nesa	33	2/3/1974	Tepra	Kanaihat
16	Rahela Khatun	24	1/9/1983	Tepra	Kanaihat
19	Nasreen Choudhury	47	2/5/1960	Dhakpara	Dishanchar
20	Mishu Mallik	17	2/6/1991	Tepra	Kanaihat

প্রদর্শিত রেকর্ড আনডু বা বাতিল করার জন্য পূর্বের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

পুরুষ/মহিলার ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান

এবারের ডেটাবেজে পুরুষ/মহিলা (Male/Female) নামে একটি ফিল্ড রয়েছে। এ ডেটাবেজ থেকে শুধু মহিলা বা শুধু পুরুষ সদস্যদের তথ্য অনুসন্ধান ও প্রদর্শন করা যেতে পারে। ফিল্ডে M দিয়ে পুরুষ এবং F দিয়ে মহিলা বোঝানো হয়েছে।

এ ডেটাবেজ থেকে শুধু মহিলা সদস্যদের তথ্য অনুসন্ধান ও প্রদর্শনের জন্য–

১. যেকোনো একটি F ফিল্ডে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে।

২. রিবনের Selection আইকন ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে। এ মেনু থেকে–

- Equals "F" এবং Contains "F" সিলেক্ট করলে শুধু বিভিন্ন গ্রামের মহিলা সদস্যদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

Table1

Sl No	Name	Male/F	Age	Date of Birth	Village	Union
8	Rahima Banu	F	25	3/5/1982	Tepra	Kanaihat
10	Charubala Dasi	F	60	5/4/1948	Nanda	Bhasantara
13	Hanifa Begam	F	41	5/6/1968	Nanda	Bhasantara
15	Kalman Nesa	F	33	2/3/1974	Tepra	Kanaihat
16	Rahela Khatun	F	24	1/9/1983	Tepra	Kanaihat
19	Nasreen Choudhury	F	47	2/5/1960	Dhakpara	Dishanchar
*	(New)					

কুয়েরি এবং রিপোর্ট

এ যাবৎ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখার কাজ করা ছাড়াও কুয়েরি পদ্ধতিতেও শর্তযুক্ত তথ্য আহরণ ও প্রদর্শন করা যায়। তবে, শর্তযুক্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং মুদ্রণ নেওয়ার জন্য প্রদর্শিত তথ্য কুয়েরি আকারে সংরক্ষণ করতে হয়। কুয়েরি আকারে সংরক্ষিত তথ্য সরাসরি মুদ্রণ নেওয়া যায়। তবে, মুদ্রণ নেওয়া বা মুদ্রিত আকারে তথ্য সরবরাহের জন্য রিপোর্ট আকারে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। এতে তথ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়।

কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ এবং সংরক্ষণ

ধরা যাক, প্রণীত টেবিলের ভিত্তিতে কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ এবং সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য –

১. ডেটাবেজের টেবিল ১ (Table 1) খোলা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি টেবিলই আছে।

২. Create মেনুর রিবনে কুয়েরি Query Design আইকন ক্লিক করলে কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণের ছক আসবে। এ ছকের সঙ্গে Show Table ডায়ালগ বক্স আসবে।

৩. Show Table ডায়ালগ বক্সে Table 1 সিলেক্ট করে Add বোতামে ক্লিক করলে ফিল্ড ধারকে টেবিলের সব ফিল্ড বা হেডিং অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে।
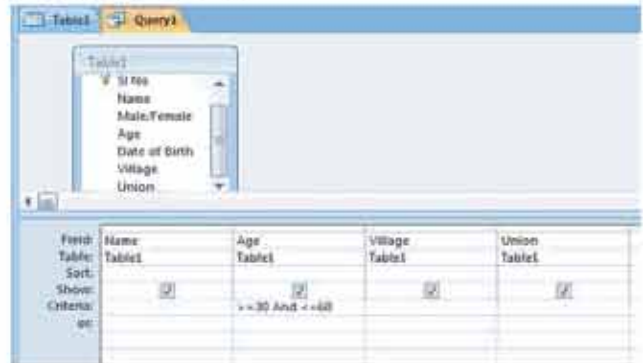
৪. Show Table ডায়ালগ বক্সের Close বোতামে ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. ফিল্ড বক্সের ফিল্ডের নামের উপর ডবল ক্লিক করলে ওই ফিল্ডটি ছকের প্রথম ফিল্ড ঘরে চলে আসবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব ফিল্ড ছকের ফিল্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে অথবা শুধু প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফিল্ড অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমান উদাহরণে নাম, বয়স, গ্রাম এবং ইউনিয়ন ফিল্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. যে ফিল্ডের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন সেই ফিল্ডের বরাবর নিচে ক্রাইটেরিয়া (Criteria) সারির ঘরে শর্ত যুক্ত করতে হবে। যেমন– বয়সের ক্ষেত্রে কয়েক রকম শর্ত আরোপ করা যেতে পারে –

নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ, নির্দিষ্ট বয়সের কম বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ বা নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যেকার ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ ইত্যাদি।

ক. নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি >৩০ টাইপ করা হয় তাহলে শুধু ৩০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে। যদি >=৩০ টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

খ. নির্দিষ্ট বয়সের কম বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি <৩০ টাইপ করা হয় তাহলে শুধু ৩০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে। যদি <=৩০ টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

গ. নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যেকার ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি >=৩০ এবং <=৬০ (>=৩০ and <=৬০) টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের বেশি বয়সী এবং ৬০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৬০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

৭. শর্ত টাইপ করার পর ডিজাইন (Design) মেনুর রিবনে রান (Run) আইকন ক্লিক করলে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

- কুয়েরি পদ্ধতিতে শর্ত আরোপ করে আহরিত তথ্যের টেবিলের উপরে Query 1 শিরোনাম বিদ্যমান থাকবে।

Table1 | Query1

Name	Age	Village	Union
Kuddus Miah	35	Basail	Raukhali
Hamid Sheik	50	Dhakpara	Dishanchar
Habib Uddin Miah	30	Dhakpara	Dishanchar
Abdul Karim Khan	40	Nanda	Bhasantara
Charubala Dasi	60	Nanda	Bhasantara
Hanifa Begam	41	Nanda	Bhasantara
Mimin Uddin Sheik	55	Dhakpara	Dishanchar
Kaiman Nesa	33	Tepra	Kanaihat

৮. Save আইকনে ক্লিক করলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।

- ডায়ালগ বক্সে কুয়েরির একটি নাম, ধরা যাক, Age Query টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে কুয়েরি ১-এর নাম Age Query নামে পরিণত হবে এবং ডেটাবেজ উইন্ডোতে Age Query তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। কুয়েরির নামের সঙ্গে কুয়েরি আইকন থাকবে।

Database উইন্ডোতে Age Query ফাইলটির নামের উপর ডবল ক্লিক করলে কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় হবে। কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় মুদ্রণ নিয়ে মুদ্রিত কুয়েরি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

কুয়েরি পদ্ধতিতে গ্রাম ও ইউনিয়নের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করা

গ্রাম ও ইউনিয়নের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করার জন্য –

১. Database উইন্ডো থেকে Table 1 সিলেক্ট করতে হবে।

২. Create মেনুর রিবনে Query Design আইকনে ক্লিক করলে কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণের ছক আসবে। এ ছকের সঙ্গে Show Table ডায়ালগ বক্স আসবে।

৩. Show Table ডায়ালগ বক্সে Table 1 সিলেক্ট করে Add বোতামে ক্লিক করলে ফিল্ড ধারকে টেবিলের সকল ফিল্ড বা হেডিং অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে।

৪. Show Table ডায়ালগ বক্সের Close বোতামে ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. ফিল্ড বক্সের ফিল্ডের নামের উপর ডবল ক্লিক করলে ওই ফিল্ডটি ছকের প্রথম ফিল্ড ঘরে চলে আসবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব ফিল্ড ছকের ফিল্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে অথবা শুধু প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফিল্ড অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমান উদাহরণে নাম, বয়স, গ্রাম এবং ইউনিয়ন ফিল্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Table1 | Age Query | Query1

Table1: Sl No, Name, Male/Female, Age, Date of Birth, Village, Union

Field:	Name	Age	Village	Union
Table:	Table1	Table1	Table1	Table1
Sort:				
Show:	☑	☑	☑	☑
Criteria:			"Basail"	
or:			"Tepra"	
			"Nanda"	

৬. যে ফিল্ডের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন সেই ফিল্ডের বরাবর নিচে Criteria সারির ঘরে শর্ত যুক্ত করতে হবে।

৭. গ্রাম ফিল্ডের বরাবর নিচে Criteria সারির ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে।

৮. ধরা যাক, বাসাইল, টেপরা এবং নন্দা গ্রামের রেকর্ড আহরণ করতে হবে। এ জন্য –

ক. Criteria ঘরে Basail টাইপ করতে হবে।

খ. Basail-এর নিচের ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসিয়ে Tepra টাইপ করতে হবে।

গ. Tepra-এর নিচের ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসিয়ে Nanda টাইপ করতে হবে।

– টাইপ করা নামগুলোর দুই পাশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন যুক্ত হয়ে যাবে।

৯. শর্ত টাইপ করার পর Design মেনুর রিবনে Run আইকন ক্লিক করলে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

Table1 | Age Query | Query1

Name	Age	Village	Union
Kasem	27	Tepra	Kanaihat
Malek	18	Nanda	Bhasantara
Kuddus Miah	35	Basail	Raukhali
Rahim Choudhury	28	Basail	Raukhali
Abdul Karim Khan	40	Nanda	Bhasantara
Rahima Banu	25	Tepra	Kanaihat
M A Kalam	16	Basail	Raukhali
Charubala Dasi	60	Nanda	Bhasantara
Khokon Molla	15	Tepra	Kanaihat
M A Latif	22	Basail	Raukhali
Hanifa Begam	41	Nanda	Bhasantara
Kalman Nesa	33	Tepra	Kanaihat
Rahela Khatun	24	Tepra	Kanaihat
Narendra Halder	70	Nanda	Bhasantara
Abdul Halim Biswas	63	Basail	Raukhali
Mishu Mallik	17	Tepra	Kanaihat
Arzu Miah	56	Nanda	

১০. Save আইকনে ক্লিক করলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।

- ডায়ালগ বক্সে কুয়েরির একটি নাম, ধরা যাক, Village Query টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে কুয়েরি ১-এর নাম Village Query নামে পরিণত হবে এবং ডেটাবেজ উইন্ডোতে Village Query তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

Table1 | Age Query | Village Query | Age Query

Age Query

Thursday, May 29, 2014
4:13:25 PM

Name	Age	Village	Union
Kuddus Miah	35	Basail	Raukhali
Hamid Sheik	50	Dhakpara	Dishanchar
Habib Uddin Miah	30	Dhakpara	Dishanchar
Abdul Karim Khan	40	Nanda	Bhasantara
Charubala Dasi	60	Nanda	Bhasantara
Hanifa Begam	41	Nanda	Bhasantara
Mimin Uddin Sheik	55	Dhakpara	Dishanchar
Kaiman Nesa	33	Tepra	Kanaihat
Nasreen Choudhury	47	Dhakpara	Dishanchar
Arzu Miah	56	Nanda	
10			

Page 1 of 1

Database উইন্ডোতে Village Query ফাইলটির নামের উপর ডবল ক্লিক করলে কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় হবে। কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় মুদ্রণ নিয়ে মুদ্রিত কুয়েরি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

রিপোর্ট

সাধারণত রিপোর্ট আকারে তথ্য সরবরাহ বা বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ ডেটাবেজ অথবা কুয়েরি ফাইলের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে তৈরি করা কুয়েরি ফাইলের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রণয়ন করা যেতে পারে। যে ফাইলের রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে সেই ফাইলটি সিলেক্ট করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে তৈরি করা কুয়েরি ফাইল সিলেক্ট করার পর-

Table1 | Age Query | Village Query | Age Query

বয়সের ভিত্তিতে প্রণীত রিপোর্ট

Thursday, May 29, 2014
4:31:12 PM

Name	Age	Village	Union
Kuddus Miah	35	Basail	Raukhali
Hamid Sheik	50	Dhakpara	Dishanchar
Habib Uddin Miah	30	Dhakpara	Dishanchar
Abdul Karim Khan	40	Nanda	Bhasantara
Charubala Dasi	60	Nanda	Bhasantara
Hanifa Begam	41	Nanda	Bhasantara
Mimin Uddin Sheik	55	Dhakpara	Dishanchar
Kaiman Nesa	33	Tepra	Kanaihat
Nasreen Choudhury	47	Dhakpara	Dishanchar

১. Create মেনুর রিবনে Report আইকনে ক্লিক করলে রিপোর্ট তৈরির উইন্ডো আসবে।

২. এ উইন্ডোতে কুয়েরি ফাইলের ফিল্ডগুলো সন্নিবেশিত থাকবে।

৩. ফিল্ডগুলোর পাশাপাশি বিস্তৃতি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হতে পারে। পাশাপাশি মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য–

২০২৩

ক. ফিল্ডের নামের উপর ক্লিক করলে ওই ফিল্ডটি সিলেক্টেড হবে। সিলেক্টেড ফিল্ডের বাম দিকের বা ডান দিকের বাহুতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ফিল্ডের পাশাপাশি মাপ কমাতে বা বাড়াতে হবে।

এছাড়া, রিপোর্টের নিচে পৃষ্ঠা সংখ্যা, ডান দিকে তারিখ ও সময় ইত্যাদির ঘর একই নিয়মে ছোট-বড় করা যাবে এবং ড্র্যাগ করে অন্য স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে। রিপোর্টের শিরোনামের উপর ডবল ক্লিক করে সিলেক্ট করার পর ইংরেজি অক্ষর মুছে বাংলায় টাইপ করা যাবে।
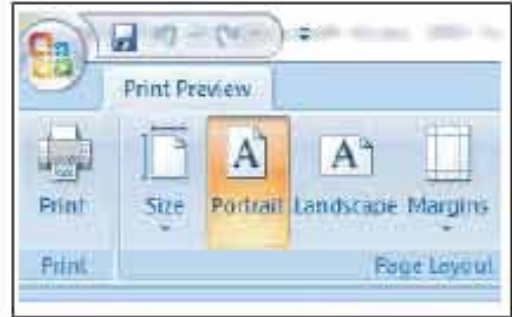
খ. View আইকনের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করতে হবে এবং ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে Print Preview কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে। এতে রিপোর্টটির মুদ্রিত অবস্থা প্রদর্শিত হবে।
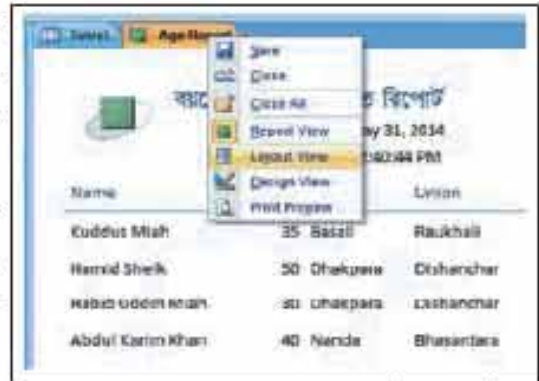
ঙ. রিপোর্টে উপস্থাপনা প্রত্যাশিত রূপে বিন্যস্ত না হলে রিবনের ডান দিকে Close Print Preview আইকন ক্লিক করলে রিপোর্ট আবার লেআউট ভিউতে ফিরে আসবে।

- ফিল্ডের আকার ও অবস্থান পুনঃবিন্যস্ত করতে হবে এবং একবারে না হলে বারবার চেষ্টা করে ফিল্ড বা কলামের মাপ ঠিক করে নিতে হবে।

৫. মুদ্রণ দেওয়ার আগে রিবনে বিদ্যমান Size, Portrait, Landscape, Margins আইকনগুলোতে ক্লিক করে কাগজ, পৃষ্ঠার মার্জিন ইত্যাদি মাপ ঠিক করে নিতে হবে। এরপর কম্পিউটারটি প্রিন্টারে যুক্ত করে Print আইকনে ক্লিক করলে রিপোর্টটির মুদ্রণ শুরু হবে।

৬. সম্পাদনার কাজ সন্তোষজনক হওয়ার পর Save আইকনে ক্লিক করলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।

৭. Save As ডায়ালগ বক্সে রিপোর্টটির একটি নাম, ধরা যাক, Age Report টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

- রিপোর্ট ফাইলটি Age Report নামে সেভ বা সংরক্ষিত হয়ে যাবে এবং ডেটাবেজ (Database) উইন্ডোতে Age Report নামে তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

রিপোর্টে গ্রিডলাইন যুক্ত করা

গ্রিডলাইন হচ্ছে রেকর্ডগুলোর উপর-নিচের রেখা বা লাইন। ফিল্ডের নিচে এমনিতেই গ্রিডলাইন থাকে। প্রয়োজন মনে করলে রেকর্ডগুলোর উপর-নিচেও গ্রিডলাইন যুক্ত করা যায় এবং যুক্ত করা গ্রিডলাইন তুলে ফেলা যায়। গ্রিডলাইন যুক্ত করা এবং তুলে ফেলার জন্য-

১. মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে রিপোর্ট ট্যাবের উপর ক্লিক করলে ড্রপ-ডাউন মেনু আসবে। এ মেনু থেকে Layout View সিলেক্ট করলে রিপোর্টটি লেআউট ভিউয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

২. রিপোর্টের ভেতর ক্লিক করতে হবে।

৩. রিবনে গ্রিডলাইন যুক্ত করার টুলগুলো সক্রিয় হবে।

৪. Gridlines ছকের নিচে নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার গ্রিডলাইনের নমুনা প্রদর্শিত হবে। বিভিন্ন প্রকার গ্রিডলাইনের মধ্যে রয়েছে Both, Horizontal, Vertical, Cross Hatch, Top, Bottom, Outline এবং None-এর ভেতর থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বা পছন্দ অনুযায়ী গ্রিডলাইন সিলেক্ট করতে হবে।

গ্রিডলাইনের যে নমুনার উপর ক্লিক করা হবে রেকর্ডগুলোর নিচ দিয়ে, উপর দিয়ে বা উপর-নিচ দিয়ে সেইরূপ রেখা বা গ্রিডলাইন যুক্ত হবে।

Table1 | Age Report

বয়সের ভিত্তিতে প্রণীত রিপোর্ট

Saturday, May 31, 2014

12:40:44 PM

Name	Age	Village	Union
Kuddus Miah	35	Basail	Raukhali
Hamid Sheik	50	Dhakpara	Dishanchar
Habib Uddin Miah	30	Dhakpara	Dishanchar
Abdul Karim Khan	40	Nanda	Bhasantara
Charubala Dasi	60	Nanda	Bhasantara
Hanifa Begam	41	Nanda	Bhasantara
Mimin Uddin Sheik	55	Dhakpara	Dishanchar
Kalman Nesa	33	Tepra	Kanaihat
Nasreen Choudhury	47	Dhakpara	Dishanchar
Arzu Miah	56	Nanda	

10

৫. গ্রিডলাইন টুল বক্সে Width ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে রেখা মোটা-চিকন করার নমুনা প্রদর্শিত হবে। এর ভেতর থেকে অপেক্ষাকৃত মোটা রেখার নমুনায় ক্লিক করলে গ্রিডলাইন মোটা হবে এবং অপেক্ষাকৃত চিকন রেখার নমুনায় ক্লিক করলে গ্রিডলাইন চিকন হবে।

৬. গ্রিডলাইনের ধরণ পরিবর্তন করার জন্য টুল বক্সে Style ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার রেখার নমুনা প্রদর্শিত হবে। এর ভেতর থেকে যে ধরনের নমুনায় ক্লিক করা হবে গ্রিডলাইনটি সেই নমুনা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

৭. গ্রিডলাইনের রং পরিবর্তন করার জন্য টুল বক্সে Color ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে একটি রঙের প্যালেট পাওয়া যাবে। প্যালেটে যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে গ্রিডলাইনে সেই রং আরোপিত হবে।

৮. রিপোর্ট থেকে গ্রিডলাইন তুলে ফেলার জন্য টুল বক্সে Gridlines ছকের নিচে নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার গ্রিডলাইনের নমুনা প্রদর্শিত হবে। নমুনাগুলোর একেবারে নিচে None-এর উপর ক্লিক করতে হবে। রিপোর্টে আরোপিত গ্রিডলাইন উঠে যাবে।

গ্রিডলাইন মোটা-চিকন করা, গ্রিডলাইনে রং আরোপ করা ইত্যাদি কাজ করার পর গ্রিডলাইনের উপরের মার্জিন রেখার বাইরে ক্লিক করলে গ্রিডলাইনের সিলেকশন চলে যাবে।

দলীয় কাজ

তোমাদের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রোল, নাম, শ্রেণি, শাখা ও বয়স ব্যবহার করে একটি ডাটাবেজ তৈরি কর এবং বয়সের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

*সফটওয়্যারের সংস্করণ ভিন্নতার কারণে টাইটেল ও মেনু বারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

অনুশীলনী

১. বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে সহজে তথ্য খুঁজতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ডেটাবেজ সফটওয়্যার খ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার

গ. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

২. Field Name এর আকার নির্ধারণের জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে?

ক. Create খ. Field name

গ. Field Size ঘ. Design View

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে –

i. বার্ষিক হিসাব ও উৎপাদনের তথ্য সহজে সংরক্ষণ করা যায়

ii. কাঙ্ক্ষিত তথ্য দ্রুত উপস্থাপন করা যায়

iii. প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ সহজে পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের লেখাটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মালেকা বেগম বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি তাঁর গার্মেন্টসের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করতে চান।

৪. মালেকা বেগমের জন্য কোন সফটওয়্যারটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী?

ক. ডেটাবেজ সফটওয়্যার খ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার

গ. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

৫. উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে মালেকা বেগম –

i. গার্মেন্টসের সকল তথ্য হালনাগাদ রাখতে পারবেন

ii. সহজেই নতুন তথ্য যোগ করতে পারবেন

iii. অফিস ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করতে পারবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. ডেটাবেজে একটি নতুন ফিল্ড যোগ করার কৌশল বর্ণনা কর।

৭. 'ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট একটি প্রতিষ্ঠানের কাজে অনেক গতির সঞ্চার করতে পারে' – বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

ডিজিটাল তথ্য সেবা: টেলিমেডিসিন ও কৃষি কল সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় সকল সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে সরকার।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সহজে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮টি হাসপাতালে বর্তমানে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে রোগীগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। মোবাইলের মাধ্যমেও রোগীগণ বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। করোনা মহামারির সময়ে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল কৃষি সেবা- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কৃষি কল সেন্টারটি খামারবাড়ি, ঢাকাতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন দেশের জনগণ।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য